ABISHKARER NESHAI
By
Abdullah Al-Muti
www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

সূচি

আবিষ্কারের নেশায় ৯
একটি মানুষ আর একটি বাহিনী ১৩
তবু যে পৃথিবী ঘুরছে ১৯
পানির ফোঁটায় আরেক জগৎ ২৬
লাস্ট বয় থেকে সেরা বিজ্ঞানী ৩০
বিজলি এল হাতের মুঠোয় ৩৪
ব্যাঙ-নাচানো বিজ্ঞানী ৩৭
ডারউইনের অভিযান ৪১
ঘর-পাগল কাজ-পাগল সেই ছেলেটি ৪৭
শুধু একটি চাবি ৫৩
সুন্দর, হে সুন্দর ৫৭
ভারি এক মজার লোক ৬২
প্রকৃতিকে বাগ মানানো ৬৮
সাদা চাল লাল চাল ৭২
আসল চাঁদ আর নকল চাঁদ ৭৭
আমি হতে চাই একজন বিজ্ঞানী ৮৩
এ বইতে যেসব বিজ্ঞানীর কথা রয়েছে ৮৮

read N share
www.banglainternet.com

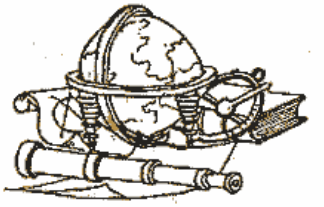

আবিষ্কারের নেশায়

সকালবেলা একগাদা কাগজপত্তর নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। লিক্‌বিক্ এসে সটান জিজ্ঞেস করে বসলে ঃ আচ্ছা মামা, গোরুর চারটে ঠ্যাং কেন?

ওর এরকম প্রশ্নে আজকাল আমি আর খুব অবাক হইনে। আনমনে জবাব দিই ঃ ঠিক যেজন্যে তোমার দুটো পা।

ঃ উঁহুঁ, পারলে না বলতে। আচ্ছা এইটে বলো দেখি, চিনি কেন খেতে মিষ্টি লাগে, আর কুইনিন লাগে তেতো।

ঃ ভারি মুশকিলে ফেললে। আপাতত এটুকু বুঝছি যে তা না হয়ে যদি অন্য রকম হত তা হলে আজ কুইনিন বাজারে একদম পাওয়া যেত না, আর কানু মুদির চিনির বস্তাগুলো রাস্তায় গড়াগড়ি খেয়ে চোখের পানিতে বুক ভাসাত।

খুশিতে লিক্‌বিকের চোখজোড়া চিকচিক করে ওঠে ঃ মামা, তোমার কী বেজায় বুদ্ধি! ফাঁকি দেবার সুযোগ পেলে আর ছাড় না!

শুনে বেশ ভাল লাগল; এমন বেপরোয়া প্রশংসা শুনলে কার না ভাল লাগে? আর আমার ফাঁকিটা যে ও ধরতে পেরেছে, তাতে লিক্‌বিক্‌ও যে দস্তুরমতো চালাক ছেলে তার আরও একটা প্রমাণ পাওয়া গেল।

আমার বুদ্ধি পরখ করার জন্যে লিক্‌বিক্ মিনিটে মিনিটে যে অজস্র প্রশ্নবাণ ছোড়ে তার সব প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে আলেফ লায়লার কেচ্ছা হয়ে দাঁড়াত। আকাশটা নীল, কিন্তু গাছের পাতা সবুজ হল কেন? সূর্য কেন পশ্চিম দিক দিয়ে না উঠে পুব দিকে ওঠে? আর কোনো মেয়ের দাড়ি গজায় না, কিন্তু ভোলা বুড়ির তিনটে দাড়ি গজাল কী করে? কখন কোন প্রশ্নটা যে কোন দিক থেকে হালুম করে ঘাড়ের ওপর এসে পড়বে, তা আগেভাগে কিছুই ঠাওর করে ওঠা যায় না।

বছর পঞ্চাশ আগে হলেও ন্যাহয় একটা-কিছু হিং টিং ছট বচন আউড়ে সবই লীলাময়ের লীলা বলে পার পাওয়া যেত। কিন্তু হায়রে, এই কলিযুগের ছেলেমেয়েদের কাছে রেহাই পাওয়াও যদি অমনি সহজ হত!

গুরুজনেরা আশা-ভরসা একরকম ছেড়েই দিয়েছেন ঃ এমনি 'বখাটে', দুর্দান্ত একটি ছেলে। ইস্কুলের বাঁধাধরা পড়ায় কিছুতেই তার মন বসত না। মাঠে-মাঠে ফড়িং আর প্রজাপতির পেছনে ছোটা, বনবাদাড়ে ঘোরা আর শিকার করা—এই ছিল তার কাজ।

সেই ছেলেটি কোনো এক সুযোগে এক জাহাজে চাকরি জুটিয়ে বেরিয়ে পড়ল দুনিয়ার নানাদিকে। জাহাজ যায় এদেশ থেকে সেদেশে। ছেলেটি দেখে শুধু নানা দেশের গাছপালা, পোকামাকড়, পাথর-নুড়ি; আর তার মনে উথলে ওঠে নানা বিচিত্র প্রশ্ন।

একই সব জন্তু-জানোয়ার, গাছপালা; কিন্তু এক দেশ থেকে আরেক দেশে তাদের চেহারায় অমন তফাত হয় কেন? এদেশের ইঁদুরগুলোর লেজ এত লম্বা হল কী করে? ওদেশের ঘোড়াগুলো কেমন বেঁটেখাটো দেখতে! এই বিজন দ্বীপের কচ্ছপ আর টিকটিকিগুলো কী বিরাট দানবের মতো এক-একটা! কেন? কেন?

এমনি সব হাজার হাজার প্রশ্ন। অদ্ভুত আর বেয়াড়া প্রশ্ন—যার উত্তর কেউ জানে না। তাই ছেলেটি—নাম তার চার্লস ডারউইন—বের করল এইসব প্রশ্নের জবাব; দুনিয়ার সামনে তুলে ধরল সে সৃষ্টির নানা রহস্য—বিবর্তনের, ক্রমবিকাশের তত্ত্ব। আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানীদের মধ্যে হল তার ঠাঁই।

ডারউইনের 'দি অরিজিন অব স্পিসিজ' (বা প্রজাতির উৎপত্তি) নামে বইখানা যেদিন বাজারে বেরুল, একদিনের মধ্যেই বিক্রি হয়ে গেল তার সবগুলো কপি। এমন আর ক'খানা বই হয়?

ডারউইনের এমনি বেপরোয়া প্রশ্ন করা, আগেকার মতবাদকে আগাগোড়া পালটে ফেলা সেকালের একদল পণ্ডিত মোটেই সুনজরে দেখতে পারেননি। ডারউইনের বিরুদ্ধে সারা দেশে তাঁরা তুমুল আন্দোলনের ঝড় তুললেন।

কিন্তু বিজ্ঞানের কাজই হল প্রশ্ন তোলা, যাচাই করা, অনুসন্ধান আর পরীক্ষার ভেতর দিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা—কেউ তাকে ঠেকাতে পারে না।

রোমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ পোপের দরবার। তাঁর চারপাশ ঘিরে বিচারে বসেছেন ধর্মের মোহান্তরা। একটি বুড়ো লোক আসামি। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর—কেননা লোকটা নাকি ধর্মদ্রোহী!

ধর্মের বইতে লেখা আছে, পৃথিবী হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্র; আর সমস্ত গ্রহ-তারা-সূর্য ঘুরছে তাকেই কেন্দ্র করে। অথচ এই মতিচ্ছন্ন লোকটা সেই চিরন্তন সত্যের বিরুদ্ধেই তুলছে জিজ্ঞাসা—এতদিনের পুরনো বিশ্বাসকেই দিতে চাইছে উলটে। দূরবীন নামে একটা অলক্ষুণে যন্ত্র বানিয়ে সে নাকি নিজের চোখে দেখেছে যে পৃথিবীই ঘোরে সূর্যের চারপাশে।

এমনতরো একটা ধর্মদ্রোহের জন্যে বাকি জীবনটা বন্দিশালায় বসে কাটানোই হল তার শাস্তি!

এই লোকটার নাম গ্যালিলিও। ধর্মের বইতে লেখা থাকলেও প্রশ্ন তুলতে সে ভয় পায়নি। সে জানত, বিচারের দণ্ড সত্যকে উড়িয়ে দিতে পারে না, জিইয়ে রাখতে পারে না অন্ধ-বিশ্বাস আর ভ্রান্ত সংস্কারকে।

গল্প আছে ঃ গাছ থেকে পাকা আপেলকে মাটিতে পড়তে দেখে নিউটন প্রশ্ন করেছিলেন ঃ আপেলটা মাটিতে পড়ল কেন?

অতি সহজ প্রশ্ন। ঘটনাটা এমনই স্বাভাবিক যে এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে, একথা কার মনে কখনো জাগেনি। কিন্তু ছোটবেলার সেই ক্ষীণপ্রাণ শিশু,

যার জন্মের সময় সবাই বলেছিল এ-ছেলে বেশিদিন বাঁচতে পারে না, তারই মাথায় এল প্রশ্নটা। আর মহাকর্ষের তত্ত্ব আবিষ্কার করে তিনি হলেন সকল যুগের সেরা বিজ্ঞানী।

কিন্তু পুরনো বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে সত্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকাই যাদের স্বভাব, তারা নিউটনকেও ছাড়েনি। তাঁর বিরুদ্ধেও উঠেছে সেই একই অভিযোগ। তারা বলেছে ঃ নিউটন খোদার আসনকে দিয়েছেন উলটে!

হল্যান্ডের এক আধপাগলা মুদি, ঝাড়ুদার। ঘষে ঘষে লেন্স বানিয়ে তার ভেতর দিয়ে রাজ্যের সব জিনিস দেখা তার নেশা। একদিন তার চোখে পড়ল বাগানের গাছতলায় দাঁড়িয়ে সাদাসিধে এক দাড়িওয়ালা বুড়ো। কথা বলতে গেলে লোকটার মুখের দুর্গন্ধে টেকা যায় না—তার দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে খিকখিক করছে ময়লা।

জিজ্ঞেস করল ঃ ওহে বুড়ো, কতদিন আগে দাঁত মেজেছ?

দাঁত মাজবার কথা শুনে বুড়ো যেন একটু অবাক হয়। দাঁত? সে তো কখনো মাজেনি সে!

আর সেই পাগলা মুদিকে তখন পায় কে! কী আছে এর এই দাঁতের ময়লায়? (শোনো একবার কথাটা, এমন কথা আর কি কারও মনে হবে—নিতান্ত পাগল ছাড়া?) যেন একটা সোনার খনি পেয়েছে এমনি করে সে বুড়োকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এল তার ঘরে। তারপর তার দাঁতের ফাঁক থেকে খুবলে তুলে নিল খানিকটা সেই আদি অকৃত্রিম ছ্যাতলা। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে সেই দাঁতের ময়লার মধ্যেই ধরা পড়ল জীবাণুর নতুন রহস্য।

এমনই অনুসন্ধিৎসা ছিল অণুবীক্ষণের আবিষ্কারক লেভনহুকের। আর তাঁর আবিষ্কার মানুষকে দিয়েছে রোগ-মারিকে কাবু করবার, দীর্ঘ সুস্থ জীবনের জন্যে সংগ্রামের এক শক্তিশালী হাতিয়ার।

তা হলে কী বোঝা গেল? বোঝা গেল কোনো ছোট প্রশ্নই আসলে ছোট নয়।

ছোট জিনিসের মধ্যেও জানবার আছে অনেক কথা, বহু বড় বড় আবিষ্কার হয়েছে অতি তুচ্ছ সূত্র থেকে, অতি সামান্য জিজ্ঞাসা থেকে।

বোঝা গেল, প্রশ্ন তোলা সব সময়েই খুব সহজ আর নিরাপদ নয়। কেননা, প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে অনেক সময়েই পুরনো ধারণা, অকেজো তত্ত্বকে বাতিল করে দিতে হয়। আর যাঁদের উঁচু আসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে পুরনো ধ্যান-ধারণাগুলো চালু থাকার ওপরে, তাঁরা তাই বেয়াড়া রকমের প্রশ্ন করা আদৌ পছন্দ করেন না।

আর বোঝা গেল, তবু অন্ধবিশ্বাস আর যুক্তিহীন সংস্কারের চেয়ে সত্যসন্ধান আর হাতে-কলমে পাওয়া জ্ঞান বড়। নতুন বৈজ্ঞানিক সত্যের জন্যে মাথা উঁচু করে না দাঁড়ালে মানুষ কখনো এগিয়ে যেতে পারে না। পারে না তার জীবনকে সুখ-শান্তি আর প্রাচুর্যে ভরে তুলতে।

বিধানের রক্তচক্ষু দেখে যারা প্রশ্ন তুলতে ভয় পায় না, প্রশ্নের জবাব না পেয়ে যারা শান্ত হয় না, অন্ধকারের ভ্রূকুটি যাদের সত্যসন্ধান থেকে বিচলিত করতে পারে না, এমনি দস্যি দামাল ছেলেমেয়েরাই হয়েছে চিরদিন পৃথিবীতে নতুন যুগের স্রষ্টা।

bi

একটি মানুষ আর একটি বাহিনী

একটি মানুষ। তাও তার বয়স হয়েছে সত্তর বছরের ওপরে। কতটুকুই-বা শক্তি তার গায়ে!

তবু এই মানুষটি লড়ছে এক বিরাট সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে। নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছে বিশাল বাহিনীকে। যে-সে বাহিনী নয়। সেকালের দুনিয়ার সবচেয়ে দুর্ধর্ষ রোমের সৈন্য তারা।

আরও আশ্চর্য, এই মানুষটি কিন্তু সেনাপতি নয়। যুদ্ধবিদ্যাই শেখেনি সে কোনোদিন। তবু তিন বছর ধরে লড়াই করে ঠেকিয়ে রেখেছে প্রবল পরাক্রমশালী রোমান বাহিনীকে। বুদ্ধির জোরে রক্ষা করেছে তার দেশের আজাদি।

এই লোকটির নাম আর্কিমিডিস। পুরনো দিনের দুনিয়ার সবচেয়ে নামজাদা বিজ্ঞানী। আজ থেকে সোয়া দু'হাজার বছর আগে বিজ্ঞানকে তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন মানুষের, দেশের নানা সমস্যার সমাধানের জন্যে।

সেকালে পণ্ডিত আর বিজ্ঞানী বলতে বোঝাত এমন সব লোককে যাঁরা শুধু ভাল ভাল তত্ত্বকথার আলোচনা করেন। কিন্তু আর্কিমিডিস উলটে দিয়েছিলেন সে-নিয়ম। তিনি দেখিয়েছিলেন বিজ্ঞানের তত্ত্বকে কী করে মানুষের জীবনে কাজে লাগানো যায়।

ভূমধ্যসাগরের বুকে একটি দ্বীপ, নাম তার সিসিলি। সেকালে এই দ্বীপের সবচেয়ে নামকরা শহর ছিল সিরাকিউজ। জায়গাটা ছিল গ্রীকদের বসতি। এখানেই আর্কিমিডিসের জন্ম হয়—খ্রিস্টের জন্মের ২৮৭ বছর আগে।

তিনি ছোটবেলায় লেখাপড়া করেছিলেন মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরে, আর বেঁচেছিলেন প্রায় পঁচাত্তর বছর। এই ক' বছরের মধ্যে গণিত আর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কতকগুলো খুব বড় বড় আবিষ্কার করে গিয়েছেন তিনি।

আর্কিমিডিস বিখ্যাত হয়ে আছেন বস্তুর ঘনত্ব আর তরল পদার্থে কোনো জিনিস ভেসে থাকার নিয়মকানুন আবিষ্কারের জন্যে। এই আবিষ্কারটিকে আজও বলা হয় আর্কিমিডিসের সূত্র, আর স্কুলের বিজ্ঞানের প্রায় সব বইতে এর কথা লেখা থাকে। এত বড় একটা আবিষ্কার কিন্তু ঘটেছিল নিতান্তই আচমকা।

সিরাকিউজের রাজা হীরো (Hiero) যেমন ছিলেন সাহসী যোদ্ধা তেমনি ছিলেন ধর্মভীরু। এক-একটি যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করতেন আর এক-একটি জিনিস উৎসর্গ করতেন কোনো দেবতার উদ্দেশে।

একবার যুদ্ধজয়ের পরে হীরো স্থির করলেন দেবতার মন্দিরে উপহার দেবেন একটি মূল্যবান স্বর্ণমুকুট। স্যাকরাকে ডেকে হুকুম করা হল, খাঁটি সোনার একটি

খুব সুন্দর মুকুট বানাতে। রাজকোষ থেকে স্যাকরাকে খাঁটি সোনা মেপে দেওয়া হল।

অপূর্ব সূক্ষ্ম কারুকাজ করা মুকুট তৈরি হয়েছে। দেখে রাজা বেজায় খুশি। মুকুটটি তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে। কিন্তু তবু মনে কেমন যেন খটকা রইল ঃ এটা সত্যি সত্যি খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি হয়েছে তো? যদি রুপো বা আর কোনো সস্তা ধাতুর খাদ মেশানো হয় তা হলে তো দেবতার কাছে তা উৎসর্গ করা চলবে না।

হীরো মুকুটটা সত্যি খাঁটি সোনার তৈরি কি না সেটা যাচাই করে দেখতে চাইলেন। যাচাই করতে হলে মুকুটটা গলাতে হয়। অথচ অমন সুন্দর মুকুটটাকে গালিয়ে দেখতে তাঁর মন ওঠে না। কিন্তু না গালিয়ে এর ভেতরে রুপোর খাদ

মেশানো হয়েছে কি না সেটা পরীক্ষাই-বা করা যায় কী করে! ডাক পড়ল তাই রাজপণ্ডিত আর্কিমিডিসের।

আর্কিমিডিস ভেবে কোনো কূলকিনারা পান না। ভাবতে ভাবতে তাঁর চোখে ঘুম নেই। নাওয়া-খাওয়ার হিসেব নেই। একদিন তিনি গোসল করার জন্যে ভরা চৌবাচ্চায় পা ডুবিয়ে দিয়েছেন। চৌবাচ্চায় পা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা পানি উছলে পড়ল। হঠাৎ আর্কিমিডিসের মাথায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। সমস্যার সমাধান তিনি পেয়ে গেছেন।

পোশাক পরার কথা ভুলে আর্কিমিডিস পথ দিয়ে ছুটলেন রাজাকে খবরটা দিতে। গ্রীক ভাষায় যে-কথা বলতে বলতে তিনি ছুটেছিলেন তা আজও সারা দুনিয়ার লোকের মুখে মুখে ফেরে ঃ ইউরেকা, ইউরেকা! আমি পেয়েছি, আমি পেয়েছি।

এই কাহিনীটা যদি সত্যি হয় তা হলে বলতে হবে আর্কিমিডিসই ইতিহাসের প্রথম আপনভোলা বিজ্ঞানী।

সমাধানটা আসলে আশ্চর্য রকম সহজ। অথচ এমন একটি সমাধানের কথা এর আগে আর কেউ কখনো ভাবেনি।

আর্কিমিডিস জানতেন সমান আকারের রুপোর চেয়ে সোনা প্রায় দু'গুণ ভারী। অর্থাৎ একই ওজনের সোনার চেয়ে রুপোর আয়তন হবে দু'গুণ বেশি। কিন্তু জটিল আকারের কোনো জিনিসের আয়তন বের করার নিয়ম তখনও কারও জানা ছিল না।

আর্কিমিডিস দেখলেন ভরা চৌবাচ্চায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা পানি উপচে পড়ছে। পানিতে ডোবানো পায়ের আয়তন আর উপচে পড়া পানির আয়তন নিশ্চয়ই হুবহু এক। এমনি করে তিনি আবিষ্কার করে ফেললেন যে-কোনো আকারের জিনিসের আয়তন বের করার নিয়ম।

আর্কিমিডিস মুকুটটাকে পানিতে ডুবিয়ে দেখলেন কতটা পানি উপচে পড়ে।

তারপর পানিতে ডোবালেন সমান ওজনের খাঁটি সোনা। দেখা গেল খাঁটি সোনা ডোবালে যতটা পানি উপচে পড়ছে, মুকুট ডোবালে উপচে পড়ছে তার চাইতে বেশি পানি। এতে প্রমাণ হল মুকুটের আয়তন সমান ওজনের খাঁটি সোনার চাইতে বেশি। অর্থাৎ এতে সোনার সঙ্গে হালকা কোনো ধাতুর খাদ মেশানো হয়েছে।

দুষ্ট স্যাকরা যখন ওনল আর্কিমিডিস কী কৌশলে তার ফাঁকি ধরতে পেরেছেন, তখন সে নিজেই তার দোষ স্বীকার করল। রাজা হীরো তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন নিশ্চয়ই। তবে কী শাস্তি দিয়েছিলেন ইতিহাসে সে-কথা জানা যায় না।

পানিতে কী করে নানা জিনিস ভেসে থাকে সে সম্বন্ধে পরীক্ষা করে আর্কিমিডিস অনেক নতুন কথা জানতে পেরেছিলেন। তেমনি একটা লম্বা লাঠির সাহায্যে চাড়া দিয়ে যে খুব বড় বড় পাথর বা ভারী জিনিস নড়ানো যায় এ কায়দাও তিনিই আবিষ্কার করেন। একে আজকাল বলা হয় 'লিভার'। এ ছাড়া কপিকলের সাহায্যে ভারী জিনিস সহজে ওপরে টেনে তোলার ব্যবস্থাও তিনিই প্রথম করেন।

মানুষের গায়ের জোর আর কতটুকু! কিন্তু লিভারের সাহায্যে চাড়া দিয়ে এই

জোর বহু গুণে বাড়ানো যায়। আর্কিমিডিস একবার বলেছিলেন ঃ আমাকে শুধু পৃথিবীর বাইরে দাঁড়াবার একটি জায়গা দাও, আর চাড়া দেবার একটা লম্বা লিভার পেলে আমি গোটা পৃথিবীসুদ্ধ নাড়িয়ে দিতে পারি।

কথাটি গিয়ে পৌঁছল রাজা হীরোর কানে। তিনি ভাবলেন এ এক পাগলা বিজ্ঞানীর মিথ্যা দম্ভ। হুকুম করলেন তাঁর সামনে প্রমাণ দিতে হবে কী করে বিরাট জিনিস তিনি নড়াতে পারেন। পৃথিবী নড়াবার দরকার নেই, শুধু ভারী কিছু একটা নড়ালেই হবে।

আর্কিমিডিস দেখলেন বন্দরে একটা নতুন জাহাজ তৈরি হয়েছে, কিন্তু তখনও তাকে পানিতে ভাসানো হয়নি। তিন-মাস্তুলের জাহাজ। শুধু জাহাজটা পানিতে নামাতেই বহু লোকের দরকার। তাতে ভরতি করা হল লোকজন, মালপত্র। এই জাহাজের সঙ্গে বাঁধলেন তিনি এক ধরনের কপিকল সমাবেশ। তারপর সেই

কপিকলের রশি ধরে দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

বহু লোক জড়ো হয়েছিল আর্কিমিডিসের শক্তিপরীক্ষা দেখতে। রশি ধরে একা তিনি টান লাগালেন। ভারী জাহাজটা আস্তে আস্তে পানিতে গিয়ে নামল। হীরো তাজ্জব হয়ে গেলেন। একি জাদুমন্ত্র!

আফ্রিকার উত্তরে এ সময়ে আর একটি শহর ছিল—তার নাম কার্থেজ। কার্থেজের রাজার সঙ্গে রোমের সম্রাটের চলছিল বিবাদ। কার্থেজের সঙ্গে সিরাকিউজের ভাব ছিল। তাই সিরাকিউজ রোমের শত্রু হয়ে দাঁড়াল। হীরোকে জব্দ করার জন্যে রোমের সবচেয়ে সেরা সেনাপতি মার্সেলাস সিরাকিউজের বিরুদ্ধে অভিযানে বেরোলেন।

ছোট শহর সিরাকিউজ। কতই-বা তার সৈন্যসামন্ত! তার বিরুদ্ধে লড়তে আসছে বিরাট রোমান বাহিনী। কিন্তু রোমান বাহিনী থমকে দাঁড়াল সিরাকিউজের রক্ষাব্যূহের কাছে এসে। নগরের রক্ষাব্যবস্থার ভার পড়েছিল বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের ওপর। আর আর্কিমিডিস নগররক্ষার এমন সব আশ্চর্য ব্যবস্থা করেছিলেন যার কথা রোমান বাহিনী কল্পনাও করেনি।

শক্তিশালী লিভার আর স্প্রিং-এর সাহায্যে সিরাকিউজের সৈন্যরা রোমান বাহিনীর ওপর বিরাট বিরাট পাথর ছুড়ে মারতে লাগল। আর এসব যন্ত্র থেকে এমন প্রচণ্ড শব্দ হতে লাগল যে তাতেই ভয় পেয়ে গেল রোমের সৈন্যরা।

মার্সেলাস সমুদ্র আর স্থল দু'দিক থেকেই সিরাকিউজ অবরোধ করে বসে রইলেন তিন বছর ধরে। আর্কিমিডিসকে কিছুতেই কাবু করা যায় না। তিনি শহরের দেয়ালের ওপর বিরাট বিরাট আয়না বসিয়ে রেখেছিলেন। সেগুলো মার্সেলাসের সৈন্যভরতি জাহাজের দিকে ঘুরিয়ে ধরতেই জাহাজের মাস্তুলে আগুন ধরে গেল। না, এও জাদু নয়—বিজ্ঞানের কৌশল।

নগরের দেয়ালের ওপর দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে এল লম্বা লম্বা দাঁড়া। তারপর সেগুলো কামড়ে ধরল মার্সেলাসের জাহাজ। কপিকল আর লিভারের কী কৌশলে জাহাজ উঠে গেল শূন্যে। তারপর ধপাস—পানিতে।

তিন বছর অবরোধ করে থাকার পর নগরের কিছু লোক বিশ্বাসঘাতকতা করল। তাদের সহায়তায় মার্সেলাসের সৈন্যরা ঢুকে পড়ল সিরাকিউজের ভেতরে।

আর্কিমিডিসের খ্যাতি তখন দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেনাপতি মার্সেলাস তাঁর সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন কেউ যেন আর্কিমিডিসের ক্ষতি না করে। কিন্তু বিজয়ের গর্বে উন্মত্ত সৈন্যরা আর্কিমিডিসের কদর বুঝল না।

গল্প আছে, সৈন্যরা যখন আর্কিমিডিসের কাছে এসে হাজির হল তখন তিনি তন্ময় হয়ে বালিতে জ্যামিতির আঁক কাটছেন। একটি সৈন্য কর্কশ গলায় তাঁকে বলল ঃ আত্মসমর্পণ করো। কিন্তু জ্যামিতির সমস্যার সমাধান নিয়ে তিনি মগ্ন—মারমুখো সৈন্যের হুকুম তাঁর কানে পৌঁছল না। তিনি অন্যমনস্কভাবে বললেন ঃ এ-সময়ে আমাকে বিরক্ত কোরো না।

সৈন্যটি আর্কিমিডিসকে চিনতে পারল না। ভাবল, লোকটির স্পর্ধা তো কম নয়! আর্কিমিডিস তার হাতে নিহত হলেন। সে খ্রিস্টপূর্ব ২১২ সালের কথা।

আর্কিমিডিস নিহত হয়েছেন শুনে সেনাপতি মার্সেলাস অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন। তাঁর জন্যে একটি সমাধি-সৌধ তৈরি করলেন তিনি। আর তার গায়ে এঁকে দেওয়া হল আর্কিমিডিসের সবচেয়ে প্রিয় জ্যামিতিক আঁকটি।

আর্কিমিডিস প্রাণ দিয়েছেন আজ থেকে সোয়া দু'হাজার বছর আগে। কিন্তু তাঁর শিক্ষা রইল আগামী দিনের সব মানুষের জন্যে।

কী সে শিক্ষা?

ঃ রোজকার জীবনের নানা সাধারণ সমস্যা থেকেই বেরিয়ে পড়ে বিজ্ঞানের তত্ত্ব। সোনা খাঁটি কি মেকি তার জবাব পেতে হলেও বিজ্ঞানের সাহায্য দরকার।

ঃ আর এই বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে মানুষের সেবায়, দেশের সেবায়। লিভারের গাণিতিক তত্ত্ব লাঘব করতে পারে মেহনতি মানুষের হাড়ভাঙা খাটুনি।

bi

তবু যে পৃথিবী ঘুরছে

সারা ইউরোপ জুড়ে নামডাক। ইউরোপের সেকালের সবসেরা বিজ্ঞানী। নাম তাঁর গ্যালিলিও গ্যালিলাই।

সত্তুরের কাছাকাছি বয়স হয়েছে তাঁর। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। রোম থেকে ধর্মের মোহান্তরা তাঁকে ডেকে পাঠালেন। বিচার বসবে তাঁর। গ্যালিলিও জানালেন তাঁর শরীর দুর্বল, ফ্লোরেন্স থেকে রোমে যেতে কষ্ট হবে। কিন্তু পোপের আদেশ খণ্ডাবার নয়।

গ্যালিলিও দাঁড়ালেন ধর্মের প্রধানদের সামনে আসামির কাঠগড়ায়। দীর্ঘ বিচারের পর বিচারকরা রায় দিলেন ঃ গ্যালিলিও দোষী। সূর্য স্থির আর পৃথিবী তার চারদিকে ঘুরছে একথা বলে গ্যালিলিও ধর্মদ্রোহিতা করেছেন, কেননা ধর্মের বইতে লেখা আছে অন্যরকম। এই ধর্মবিরোধী মিথ্যাপ্রচারের অপরাধে তাঁর হবে কঠোর শাস্তি। তবে দোষ স্বীকার করে ক্ষমা ভিক্ষা করলে রেহাই দেওয়া যেতে পারে।

ধীরে ধীরে সৌম্য বৃদ্ধ বিচারকদের সামনে নতজানু হলেন। মাথা নিচু করে ভাঙা গলায় আউড়ে গেলেন যা তাঁকে বলতে বলা হল। বললেন ঃ সূর্য এ বিশ্বের কেন্দ্র একথা সত্যি নয়। পৃথিবী ঘুরছে তার মেরুদণ্ডের ওপর, ঘুরছে সূর্যের চারপাশে—একথাও সত্যি নয়। এসব কথা বলে তিনি অপরাধ করেছেন।

১৬৩৩ সালের ২২শে জুন তারিখে ঘটেছিল এ-ঘটনা। গির্জার কর্তারা তাঁদের রায় ঘোষণা করে ভাবলেন তাঁরা জিতেছেন। চিরদিনের জন্যে বন্ধ করে দিয়েছেন তাঁরা গ্যালিলিওর মুখ। উপড়ে ফেলেছেন তাঁর ধর্মদ্রোহী ধারণার শেকড়।

অসুস্থ দুর্বল গ্যালিলিও গির্জার বাইরে বেরিয়ে তাকালেন উদার আকাশের দিকে। তারপর তাকালেন নিচে, পৃথিবীর দিকে। মাটিতে পা ঠুকে বিড়বিড় করে বললেন ঃ তবু যে পৃথিবী ঘুরছে!

গ্যালিলিও জন্মেছিলেন ইতালির পিসা শহরে। ১৫৬৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে। ষোলো শতক ইউরোপে প্রবল আলোড়নের যুগ। কিছু লোক বেরিয়ে পড়ছে চারদিকে নানা অজানা দেশের সন্ধানে। ছাপাখানার আবিষ্কার হওয়ায় সস্তায় বইপত্র ছাপা হতে শুরু করেছে। প্রকৃতির নানা রহস্য আবিষ্কারের নেশা পেয়ে বসেছে মানুষকে।

গ্যালিলিওর জীবনেও লেগেছিল এই আলোড়নের ছোঁয়া। ছোটবেলায় নানা দিকে তাঁর উৎসাহ আর আগ্রহ দেখা গেল। আশ্চর্য কৌশলে খেলনা তৈরিতে, গান বাজনায়, কবিতা লেখায়, ছবি আঁকায়। কিছুদিন এক গির্জার স্কুলে পড়েছিলেন।

তারপর গেলেন পিসার বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারি পড়তে।

উনিশ বছর বয়স তখন তাঁর। এক রোববারে গিয়েছেন পিসার বড় গির্জায়। এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে চোখ পড়ল তাঁর বিশাল উঁচু গির্জার ছাদ থেকে ঝোলানো সুন্দর এক ঝাড়বাতির দিকে। ঝাড়বাতিটা হাওয়ায় দুলছিল। দুলতে দুলতে কখনো সরে যাচ্ছিল বেশ খানিকটা দূরে, তারপর অল্প কিছুটা দূরে। হঠাৎ গ্যালিলিওর মনে হল ঝাড়বাতির দোলা বেশি হোক বা কম হোক, প্রত্যেকটা দোলায় যেন একই সময় লাগছে।

ডাক্তারি পড়তে গিয়ে তিনি শিখেছিলেন স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের নাড়ির স্পন্দন বারবার একই সময় নেয়। গ্যালিলিও নিজের নাড়ি টিপে ধরে ঝাড়ের এক-একটা দোলা কতগুলো স্পন্দনের সমান সময় নিচ্ছে সেটা মাপতে লাগলেন। আর আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, দোলা যত বড় বা যত ছোটই হোক, সত্যি সত্যি নাড়ির স্পন্দনের সংখ্যা একই রকম থাকছে। এমনি করে গ্যালিলিও পেন্ডুলামের নিয়ম আবিষ্কার করে ফেললেন। নিখুঁতভাবে সময় মাপার এক নতুন উপায় জানা গেল।

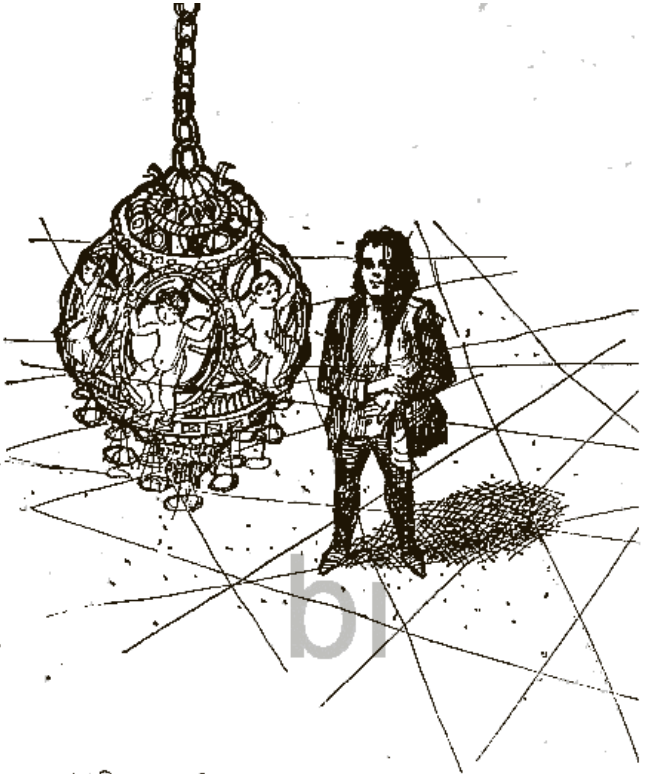

ডাক্তারি পড়ায় গ্যালিলিওর তেমন উৎসাহ ছিল না। তা ছাড়া এই পড়া শেষ করার মতো টাকাকড়িও ছিল না তাঁর। তাই ডাক্তারি ছেড়ে তিনি গণিত পড়তে শুরু করলেন। চব্বিশ বছর বয়সে পিসার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি হলেন গণিতের অধ্যাপক।

সেকালে গণিত পড়ানো মানে ছিল শুধু কাগজে-কলমে আঁক কষা। কিন্তু গ্যালিলিওর ঝোঁক সবকিছু হাতে-কলমে পরখ করে দেখার দিকে। গণিতের সূত্রও তিনি যাচাই করতে চাইতেন নানা ধরনের পরীক্ষা করে।

প্রাচীন গ্রীসের মস্ত পণ্ডিত দার্শনিক ছিলেন অ্যারিস্টটল। তিনি বলে গিয়েছেন, কোনো জিনিস যত ভারী হবে সেটা শূন্যে ছেড়ে দিলে তত তাড়াতাড়ি মাটিতে পড়বে। গ্যালিলিওর আগে দু'হাজার বছর ধরে পণ্ডিতরা একথা বিশ্বাস করে এসেছেন। কেউ কোনো প্রশ্ন তোলেন নি।

আর প্রশ্ন তুলবেনই-বা কেন! ভারী জিনিস ছেড়ে দিলে মাটিতে তাড়াতাড়ি

পড়বে। হালকা জিনিস পড়বে ধীরে ধীরে— এ তো সোজা বুদ্ধির কথা! এতে আর সন্দেহ করবার কী আছে?

কিন্তু প্রশ্ন তুললেন গ্যালিলিও। তিনি বললেন, পরীক্ষা করেই দেখা যাক-না কথাটা সত্যি কি না।

পিসা শহরে রয়েছে সেকালের দুনিয়ার সাত আশ্চর্যের এক আশ্চর্য ঃ এক বিশাল হেলানো স্তম্ভ। বারো শতকে এই স্তম্ভ তৈরি হয়েছিল গির্জার ঘণ্টা বাজাবার চূড়ো হিসেবে। প্রায় একশো আশি ফুট উঁচু এই স্তম্ভ। আর তার আগাটা খাড়া না থেকে রয়েছে প্রায় চোদ্দ ফুট হেলে।

শোনা যায় ১৫৯০ সালে একদিন গ্যালিলিও এই স্তম্ভের চূড়োয় উঠলেন দুটো একই মাপের গোলা নিয়ে। তার একটা তৈরি লোহার, আরেকটা কাঠের। লোহার তৈরি গোলাটা কাঠের গোলার চেয়ে দশগুণ ভারী। অ্যারিস্টটলের কথা যদি সত্যি হয় তা হলে স্তম্ভের ওপর থেকে দুটো গোলা একসঙ্গে ছেড়ে দিলে লোহার গোলাটা পড়বে দশগুণ তাড়াতাড়ি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর ছাত্র ছাড়া আরও বহু লোক জড়ো হয়েছে স্তম্ভের নিচে। তাদের মুখে অবিশ্বাসের হাসি। কেউ কেউ বকছে গ্যালিলিওকে। এই

ছিটগ্রস্ত লোকটা প্রশ্ন তুলেছে অ্যারিস্টটলের শিক্ষার বিরুদ্ধে। পণ্ডিতদের যুগ যুগের নিশ্চিত বিশ্বাস উলটে দিতে চাইছে সে!

গ্যালিলিও সাবধানে গোলা দুটো স্তম্ভের ওপরের রেলিং-এর ধারে ধরলেন। তারপর দুটোকেই ছেড়ে দিলেন একসাথে। দর্শকরা সব উৎসুক হয়ে তাকাল সেদিকে।

একি! সবাই অবাক হয়ে দেখল দুটো গোলাই মাটিতে ধপাস করে পড়ল একসাথে। একটাই শব্দ হল পড়ার।

নিজেদের চোখ আর কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারল না কেউ। বিশ্ববিদ্যালয়ের এতসব জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত এতদিন ধরে যা শেখাচ্ছিলেন তা কি মিথ্যা হয়ে গেল? তাঁদের পাণ্ডিত্যের অভিমানে এত বড় আঘাত দেবার পর গ্যালিলিওর পক্ষে আর পিসায় থাকা সম্ভব হল না। তিনি গিয়ে যোগ দিলেন পাদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে।

এদিকে হল্যান্ড থেকে খবর এসে পৌঁছেছে এক আশ্চর্য আবিষ্কারের। সেখানে নাকি কাচের পরকলা দিয়ে এমন এক যন্ত্র তৈরি হয়েছে যাতে দূরের জিনিস খুব কাছে দেখায়। গ্যালিলিও মেতে উঠলেন এমনি এক যন্ত্র তৈরি করার জন্যে।

ছ'মাস ধরে পরিশ্রম করার পর তাঁর দূরবীন বানাবার চেষ্টা সফল হল। ১৬০৯ সালে ভেনিস শহরে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সামনে তাঁর দূরবীন দেখানো হল। গীর্জার উঁচু চূড়োয় উঠে তাঁরা সেই দূরবীনের নলে চোখ লাগিয়ে দেখতে লাগলেন বহু দূরের জাহাজ। এত দূরের যে দূরবীনে দেখার আরও ঘণ্টা দুই পরে খালিচোখে দেখা গেল সে-জাহাজ বন্দরের দিকে এগিয়ে আসছে।

সবাই দেখে চমৎকৃত হল। কর্তৃপক্ষ পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে তাঁর বেতন তিন গুণেরও বেশি বাড়িয়ে দিলেন। দিনরাত হাজার হাজার লোক এসে তাঁর কাছে ভিড় জমাতে লাগল এই আশ্চর্য নলের ভেতর দিয়ে শুধু এক-নজর দেখবার জন্যে।

গ্যালিলিও দূরবীন বাগিয়ে ধরলেন আকাশের দিকে। চাঁদের গায়ে দেখলেন তিনি উঁচু উঁচু পাহাড় আর গভীর খাদ। কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলে দেখলেন নতুন তারা—যাদের খালিচোখে দেখতে পাওয়া যায় না। চোখে পড়ল তাঁর সূর্যের গায়ে কালো কালো দাগ। ছায়াপথ যে আসলে অগুনতি তারার মেলা তাও তাঁর দূরবীনের চোখে ধরা পড়ল।

সবচেয়ে আশ্চর্য দৃশ্য দেখলেন তিনি ১৬১০ সালের ৭ই জানুয়ারি তারিখে। বৃহস্পতি গ্রহের দিকে দূরবীন দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন তার আশেপাশে রয়েছে চারটি ছোট ছোট 'তারা'। রাতের পর রাত দেখতে দেখতে বুঝলেন আসলে এগুলো হল বৃহস্পতির চাঁদ—নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরছে বৃহস্পতির চারপাশে।

এতদিন সবাই জানত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু ঘুরছে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে। গ্যালিলিওর জন্মের একুশ বছর আগে পোল্যান্ডের বিজ্ঞানী কোপার্নিকাস একটি বই লিখেছিলেন। তাতে লেখা ছিল সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে না। পৃথিবীই ঘোরে সূর্যের চারপাশে। সেকালের পণ্ডিতরা আর পাদরিরা একে ধাপ্পা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। পৃথিবী সারা বিশ্বের কেন্দ্র নয়—এমন কথা কি কখনো সত্যি হতে

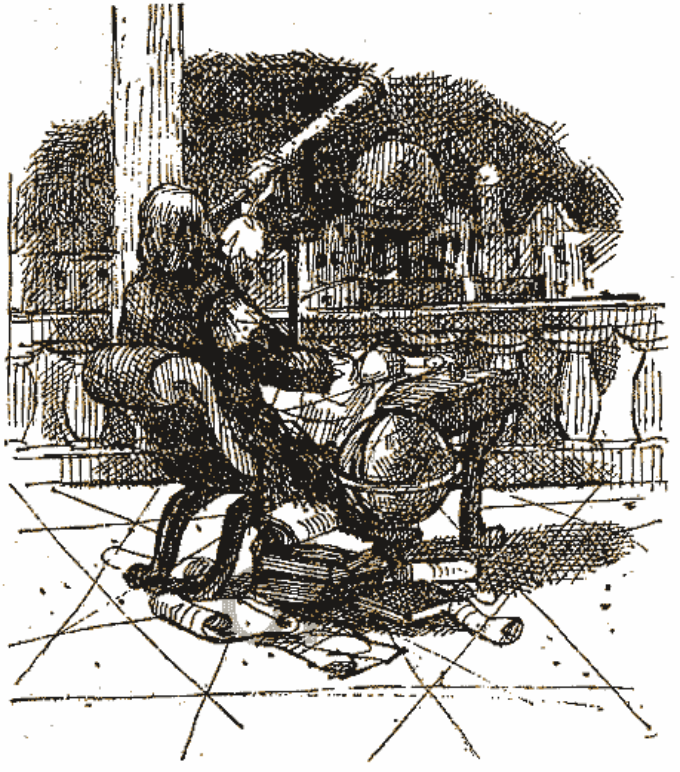

পারে? কিন্তু এবার গ্যালিলিও নিজের চোখে দেখেছেন চারটি জ্যোতিষ্ক পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে না, ঘুরছে বৃহস্পতির চারপাশে।

১৬১১ সালে গ্যালিলিও তাঁর দূরবীন নিয়ে এলেন রোমে। ধর্মগুরুদের মধ্যে অনেকে তাঁর ওপর চটে লাল হলেন। এই লোকটা শুধু অ্যারিস্টটলকে অবিশ্বাস করেনি, সে নিখুঁত বিশ্বের গায়ে লাগাতে চাচ্ছে কালিমা। লোকটা বলে কিনা চাঁদের স্বর্গীয় সুষমার গায়ে আছে রুক্ষ পাহাড়-পর্বত, উজ্জ্বল সূর্যের সুডোল দেহেও আছে কলঙ্ক।

অনেকে গ্যালিলিওর দূরবীন দিয়ে তাকিয়ে দেখতেও গররাজি হলেন। কেউ কেউ বললেন, বৃহস্পতির চাঁদ কেউ কখনো খালিচোখে দেখতে পায়নি। কাজেই ওগুলো আদৌ রয়েছে একথা বিশ্বাস করা যায় না। গ্যালিলিওর যন্ত্রে যদি ওগুলো দেখা যায় তাহলে দোষটা আসলে যন্ত্রেরই। এ নিশ্চয়ই শয়তানের কারিগরি।

গ্যালিলিও তাঁর মতের সমর্থনে লিখতে শুরু করলেন। তাঁর প্রতিপক্ষের অন্ধতা আর বোকামিকে বিদ্রূপ করলেন তীব্র ভাষায়। ১৬৩০ সালে বেরুল তাঁর বিখ্যাত বই ঃ বিশ্বের স্বরূপ সম্বন্ধে দুই মতের দ্বন্দ্ব।

ধর্মের নেতারা একেবারে খেপে উঠলেন। ১৬৩৩ সালে তাই তাঁর বিরুদ্ধে বসল বিরাট ধর্মীয় বিচারসভা।

এই বিচারের রায় কি বিজ্ঞানের সত্যকে উড়িয়ে দিতে পেরেছিল?

সেদিন এক বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা যাঁরা সেজেছিলেন সেই বিচারকদের নাম আজ আর কেউ মনে রাখেনি। কিন্তু গ্যালিলিওর নাম দুনিয়ার ঘরে ঘরে। চিরদিন মানুষ তাঁর নাম মনে রাখবে।

মনে রাখবে তার কারণ গ্যালিলিও সত্যকে খুঁজেছিলেন প্রাচীন পুঁথির জীর্ণ পাতায় নয়, প্রকৃতির বিশাল আঙিনায়। যে-সত্য তিনি আবিষ্কার করেছিলেন তাকে প্রকাশ করেছিলেন পরিচ্ছন্ন গণিতের ভাষায়।

মনে রাখবে কারণ তিনি বিজ্ঞানের সত্যকে পৌঁছে দিয়েছিলেন সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে। ইউরোপে তিনিই প্রথম বিজ্ঞানী যিনি পণ্ডিতি ভাষা ল্যাতিনের বদলে দেশের সাধারণ ভাষায় বিজ্ঞানের কথা লিখেছিলেন। তাই গ্যালিলিও সারা ইউরোপে বিজ্ঞানের সত্য নিয়ে এমন ঝড় তুলেছিলেন।

bi

পানির ফোঁটায় আরেক জগৎ

বদ্ধপাগল না হলে এমন হয় না। হল্যান্ডের ডেল্‌ফ্‌ট শহরে সবাই বলাবলি করে তার কথা। দিন নেই রাত নেই পাগলটা ছোট ছোট কাচের টুকরোর গায়ে চোখ লাগিয়ে মশগুল হয়ে কী যে দেখে সে-ই জানে!

লোকটার নাম আন্টন ভ্যান লেভনহুক। জন্ম ১৬৩২ সালের ২৪শে অক্টোবর। জীবনের নব্বইটা বছর সে কাটিয়েছে ডেল্‌ফ্‌ট শহরেই। ছেলেবেলায় লেখাপড়া তেমন হয়নি। ষোলো বছর বয়সে বাপ মারা যায়। তাই স্কুল ছেড়ে চাকরি নিতে হয় এক মুদির দোকানে। ক'বছর পরে জুটল নগরসভার ঝাড়ুদারের কাজ।

লেভনহুক ছোটবেলায় চশমার দোকানে দেখেছিল কাচের টুকরো ঘষে ঘষে লেন্স বা আতশি কাচ তৈরি করা যায়। এই কাচের ভেতরে দিয়ে তাকালে কোনো জিনিসকে সামান্য একটু বড় দেখায়। খুব সামান্যই একটুখানি বড়। কিন্তু তাই বা কম কী। লেভনহুক অবাক হয়ে ভাবল আরও ভাল করে ঘষতে পারলে হয়তো তার ভেতর দিয়ে সব জিনিস আরও বড় দেখাবে।

সেই থেকে ওই এক নেশা তাকে পেয়ে বসল। রোজ যেত সে চশমার দোকানে। দেখত সেখানে কী করে কাচ ঘষে। তারপর বাড়ি ফিরে চেষ্টা করত ছোট ছোট কাচের টুকরো ঘষে তার চেয়েও ভাল, আরও নিখুঁত লেন্স বানাতে। হাতে ঘষে ঘষে লেন্স তৈরি—বড্ড খাটুনির কাজ। বহু দিনের চেষ্টার পর সে এমন লেন্স বানিয়ে ফেলল যা দিয়ে খুদে খুদে জিনিসকে দু'শো আড়াইশো গুণ বড় দেখায়।

এমনি ছোট কাচের লেন্স সে বসিয়ে নিল রুপো বা তামার পাতের গায়ে ফুটো করে তার ওপর। আর এই যন্ত্রের নাম রাখল মাইক্রোস্কোপ বা অণুবীক্ষণ। মাইক্রো বা অণু মানে হল খুব ছোট। আর স্কোপ বা বীক্ষণ মানে হল দেখা। অর্থাৎ কিনা যে যন্ত্র দিয়ে খুব ছোট জিনিস দেখা যায়।

লেভনহুক তার তৈরি মাইক্রোস্কোপ নিয়ে যেন একেবারে মেতে উঠল। সারাক্ষণ সে শুধু ওর ছোট্ট লেন্সের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। দেখে এক নতুন জগৎ—যা আর কেউ দেখতে পায় না। কেউ কল্পনাও করতে পারে না এমনতরো এক জগৎ রয়েছে মানুষের চোখের আড়ালে। ডেল্‌ফ্‌টের বোকা লোকেরা এই আধপাগলা ঝাড়ুদারকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করে। কিন্তু সে তার আপন জগতে বিভোর হয়ে থাকে। দিনের আলো ফুরিয়ে রাত নামে। সে তার ঘরে মোমের আলোতে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকে মাইক্রোস্কোপের ফুটোয়।

তাও কি তার একটা-দুটো মাইক্রোস্কোপ! আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে ঘষে ঘষে সে একের পর এক লেন্স তৈরি করে। তারপর তার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দিনের পর দিন। এমনি করে সারাজীবনে সে কম করেও ৪১৯টি লেন্স বানিয়ে ফেলে।

কী দেখে সে এমনি করে?—কী যে দেখে না তা-ই বলা মুশকিল। মাছির মাথা, তিমিমাছের একটুকরো মাংসপেশী, মরা গরুর চোখ, মাকড়সার জাল, বোলতার হুল, উকুনের ঠ্যাং, নিজের গায়ের চামড়া—কোনোকিছুই বাদ যায় না। একদিন এক বন্ধু এসেছিল তার সঙ্গে দেখা করতে। বন্ধুর লম্বা লম্বা গোঁফের দিকে

তাকিয়ে তার বড় লোভ হল। তাড়াতাড়ি বন্ধুর একটা গোঁফ উপড়ে নিয়ে ধরল তার লেন্সের তলায়। বন্ধুও দেখল তাকিয়ে। দেখে তার বিশ্বাস হয় না যে এই রুক্ষ গাছের গুঁড়ির মতো জিনিসটা আসলে তারই গোঁফ।

লেভনহুক তার লেন্সের ভিতর দিয়ে যা-কিছু দেখে তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। আর সেসব একটা খাতায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এঁকে রাখে। কিন্তু হলে কী হয়, সে নিজে তেমন লেখাপড়া জানে না, আর তার পাড়া-প্রতিবেশীরাও তেমনি মুখ্য-সুখ্য। তার কাজের কদর তারা কেউ বোঝে না।

কেমন করে জানি একদিন লেভনহুকের কানে গেল, বিলেতে বিজ্ঞানীদের এক রয়্যাল সোসাইটি গড়া হয়েছে আর তারা তার দেখা এসব জিনিস সম্বন্ধে জানতে পেলে খুশি হবে। সেই থেকে রয়্যাল সোসাইটির নামী পণ্ডিতদের সঙ্গে হল্যান্ডের এই ঝাড়ুদারের চিঠিপত্রের আদান-প্রদান শুরু হল।

লেভনহুক কখনো নিজের দেশের বাইরে যায়নি। কিন্তু পঞ্চাশ বছর ধরে লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটিতে সে লিখে পাঠাতে লাগল তার দেখা নানারকম আশ্চর্য জিনিসের বর্ণনা। নতুন নতুন সব চমকপ্রদ আবিষ্কারের কাহিনী। পণ্ডিতেরা প্রথম প্রথম বিশ্বাস করলেন না তার কথা। কিন্তু রয়্যাল সোসাইটির এক বিজ্ঞানী তার বর্ণনামতো নিজেই এক মাইক্রোস্কোপ বানিয়ে ফেললেন। তারপর লেভনহুক তার তৈরি ২৬টা মাইক্রোস্কোপ উপহার পাঠাল রয়্যাল সোসাইটির সদস্যদের জন্য। নিজের চোখে যখন তাঁরা দেখলেন মাইক্রোস্কোপের মধ্য দিয়ে নতুন এক জগতের দৃশ্য, তখন আর অবিশ্বাস করার উপায় রইল না।

১৬৬৫ সালে লেভনহুক একটা ব্যাঙাচির স্বচ্ছ লেজ নিয়ে ধরলেন তাঁর লেন্সের তলায়। অবাক হয়ে দেখলেন সূক্ষ্ম শিরার মধ্য দিয়ে রক্ত বয়ে চলেছে। তাঁর আগে আর কেউ কখনো শিরার ভেতর রক্ত চলাচল দেখতে পায়নি। কয়েক বছর পর তিনি রক্তের ভেতর লাল কণিকাও আবিষ্কার করলেন।

সবচেয়ে আশ্চর্য আবিষ্কার করলেন তিনি ১৬৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। শরতের আকাশ থেকে মাঝে মাঝে ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়ছিল। বাগানে একটা গামলায় জমে ছিল এই বৃষ্টির পানি। লেভনহুকের মনে হল, আচ্ছা, খানিকটা বৃষ্টির পানি লেন্সের তলায় নিয়ে দেখলে কেমন হয়। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। লেন্সের গায়ে চোখ লাগিয়ে তিনি যা দেখলেন তাতে নিজের চোখকে বিশ্বাস করা শক্ত হল।

একি! এ যে সব জানোয়ার! খুদে খুদে জানোয়ার পানিতে মনের আনন্দে নড়ে বেড়াচ্ছে। জ্যান্ত জানোয়ার—অথচ এত ছোট যে তার কাছে একটা উকুনও মনে হবে হাতির সমান।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তিনি দেখতে লাগলেন সেই পানির ফোঁটা। এক ফোঁটা পানির মধ্যে রয়েছে জন্তু-জানোয়ারের এক বিশাল জগৎ। অসংখ্য জীবাণু ছুটোছুটি করছে তাতে! এমন এক বিচিত্র জীবের বিচিত্র জগতের কথা কেউ কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি।

বিলেতের রয়্যাল সোসাইটির জ্ঞানীগুণী সদস্যরা যখন লেভনহুকের চিঠি পেয়ে জানালেন এক ফোঁটা পানিতে রয়েছে হাজার হাজার খুদে জানোয়ার তখন প্রথমে তাঁরা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু দু'-একজন বললেন, আচ্ছা, কথাটা পরীক্ষা করে দেখাই যাক-না! আর মাইক্রোস্কোপ নিয়ে পরীক্ষা করে তাঁরা দেখলেন, সত্যি তো, এই ঝাড়ুদার যা লিখেছে তা মোটেই ফেলবার মতো কথা নয়। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অসাধারণ আবিষ্কার করেছে সে। এরও দু'শো বছর পরে ফরাসি বিজ্ঞানী পাস্তুর প্রমাণ করলেন এগুলো হল এককোষী জীব—আর এরাই নানা ধরনের অসুখবিসুখের কারণ। মানুষ এদের হদিস না পেলে আজকের ডাক্তারি বিদ্যার জন্মই হত না।

লেভনহুকের বয়স যত বাড়তে লাগল মাইক্রোস্কোপের অজানা রহস্যের জগতের দিকে টান তাঁর যেন ততই বেড়ে চলল। অনবরত তিনি নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করে চললেন। চারদিক থেকে তাঁর জন্যে অজস্র সম্মান আসতে লাগল। বিলেতের রয়্যাল সোসাইটি তাঁকে সাদরে তাঁদের সদস্য করে নিল।

ডেল্‌ফ্‌টের লোকেরা একদিন অবাক হয়ে দেখল, তাদের ছোট শহরে পায়ের ধুলো পড়েছে রাশিয়ার জার পিটার দ্য গ্রেটের। তিনি এসেছেন সেই আধপাগলা ঝাড়ুদারের মাইক্রোস্কোপের ভেতর দিয়ে একনজর তাকিয়ে দেখতে। আর একবার বিলেতের রানি এসে হাজির হলেন লেভনহুকের সঙ্গে দেখা করতে! সে যেমন-তেমন সম্মান নয়!

লেভনহুকের বয়স নব্বই পেরিয়েছে। তিনি মৃত্যুশয্যায়। এক বন্ধুকে কাছে ডেকে আস্তে আস্তে বললেন ঃ আমার টেবিলের ওপর দু'টি চিঠি লেখা আছে। লন্ডনে রয়্যাল সোসাইটির কাছে পাঠাতে হবে। দেখো, ভুলে যেও না যেন।

জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত কী গভীর নিষ্ঠা, কী একাগ্র সাধনা বিজ্ঞানের জন্য।

লাস্ট বয় থেকে সেরা বিজ্ঞানী

গ্রামের বাইরে স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার মাঠে। সেই অন্ধকারে একটি ছেলে চেষ্টা করছে ঘুড়ি ওড়াতে। কাঠি আর কাপড়ের তৈরি ঘুড়ি—ছেঁড়া কাপড় জোড়া দিয়ে দিয়ে তার আবার বিরাট লম্বা লেজ। শুধু তা-ই নয়; সেই লেজের আগায় ঝোলানো ছোট্ট একটি আলো।

ছেলেটি ভাবছে, যদি ঘুড়ি আকাশে ওড়ে, তখন আলো দেখে সবাই হয়তো ভাববে, বুঝি একটি নতুন তারাই উঠল আকাশে। কেউ হয়তো ভাববে, এটা রোজকেয়ামতেরই পূর্বলক্ষণ। ছেলেটি ভাবে আর তার ঠোঁটের কোণায় দুষ্টু হাসি খেলে যায়।

কিন্তু সে ঘুড়ি কি আকাশে ওড়ে? আলোর ভারে লেজ তার পড়েছে ঝুলে। যতবারই সুতো ধরে টানে, ততবারই ঘুড়িটা গোঁত্তা খেয়ে মাটিতে পড়ে। শেষ পর্যন্ত তাকে হাল ছেড়ে দিতে হয়।

কথাটা কেমন করে গ্রামের আরও দু'-চারজন লোকের কানে গিয়ে ওঠে। যারা শোনে, তারা বলাবলি করে : যেমন ব্যাটা আহাম্মক আমাদের বোকা বানাতে গিয়েছিল, তেমনি তার উচিত ফল হয়েছে। মূর্খটা এসব পাগলামি রেখে মাস্টারের কথামতো ইস্কুলের পড়া করলেও তো হত।

এসব কথা ছেলেটি বড় হয়ে নিজেই তার আত্মজীবনীতে লিখে গেছে। বিলেতের স্টিলিংটন বলে একটি জায়গায় গ্রামের স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে সে ছিল লাস্ট বয়। মাস্টাররা রায় দিয়েছিলেন—এর মাথায় গোবর ছাড়া আর কিছু নেই। সহপাঠীরা তাকে নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করত।

কিন্তু বড় হয়ে সেই ছেলেটিই এমন সব আবিষ্কার করে বসলেন—যা দেখে দুনিয়ার সব বড় বড় বিজ্ঞানী থেমে গেলেন; তাঁকে গুরু বলে মানলেন। তাঁকে করা হল বিলেতের পার্লামেন্টের সদস্য, সম্রাট তাঁকে ভূষিত করলেন 'নাইট' বা 'স্যার' উপাধি দিয়ে। পণ্ডিতদের সেরা প্রতিষ্ঠান রয়্যাল সোসাইটি তাঁকে সভাপতি নির্বাচিত করল।

সেই ছেলেটির নাম ছিল আইজাক নিউটন। নিউটনের জন্ম হয়েছিল ১৬৪২ সালের ২৫শে ডিসেম্বর। বাপ ছিলেন কৃষক, কিন্তু নিউটন জন্মাবার আগেই তিনি মারা যান। গাঁয়ের ইস্কুলেই ছোটবেলায় পড়াশোনা; কিন্তু পড়ার চেয়ে সূর্যঘড়ি, জলঘড়ি, এমনিতরো কলকব্জা নিয়ে নাড়াচাড়ার ঝোঁকই তাঁর বেশি দেখা যেত।

যখন তাঁর ষোলো বছর বয়স, তখন একদিন বিলেতে ভীষণ ঝড় হয়। সে কী প্রচণ্ড হাওয়ার দাপট! বিলেতের ইতিহাসে এত বড় ঝড় খুব কমই হয়েছে।

নিউটনের তখন একটা শখ ছিল, হাওয়ার বেগ মাপার। হাওয়ার যখন দাপট খুব বেশি, এমনি সময় তিনি হঠাৎ বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। যেদিকে হাওয়া বইছে, সেদিকে দিলেন এক লাফ; যেখানে পা গিয়ে পড়ল, সেখানে দিলেন একটা দাগ। তারপর ঠিক উলটো দিকে দিলেন আর এক লাফ, আর মাটিতে দিলেন আরেক দাগ। পাড়া-প্রতিবেশীরা জানালার ফাঁক দিয়ে দেখল এই পাগলের অবাক কাণ্ড।

আত্মীয়স্বজন ভেবেছিল, কৃষকের ছেলে কৃষকই হবে। কিন্তু ছেলের ঝোঁক বিজ্ঞানের বই যোগাড় করে পড়ার আর নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত পরীক্ষা করার। একদিন বাজারে পাঠানো হয়েছে নিউটনকে; কয়েকটি ভেড়া, কিছু ডিম, আরও অন্যান্য জিনিস বিক্রি করে আসার জন্যে। কিন্তু তিনি আরেকটি লোককে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর হয়ে এগুলো বেচে দিতে; আর নিজে এক ঝোপের তলায় বসে মশগুল হয়ে পড়তে লাগলেন একটা অঙ্কের বই।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর যখন তাকে সেখানে পাওয়া গেল, তখন তো বাড়িতে একটা রীতিমতো কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। কী করা যায় এমন একটি অপদার্থ ছেলেকে নিয়ে? তাঁকে উদ্ধার করলেন এক চাচা। তিনি বললেন, দাও একে কলেজে পাঠিয়ে—সেখানে বসে যত খুশি অঙ্ক কষুক। তাই তাঁকে পাঠানো হল কেমব্রিজ।

সত্যি সত্যি তিনি কলেজে গিয়ে অঙ্কে খুব ভাল করলেন। প্রথম বছরেই তিনি গণিতের এক নতুন দিক ক্যালকুলাস আবিষ্কার করে ফেললেন। লিখে রাখলেন সেসব। কিন্তু কাউকে বললেন না কিছুই। চাঁদের চারদিকে মাঝে মাঝে চাকতির মতো আলোর প্রভা ('চাঁদের সভা') দেখতে পাওয়া যায়। তা যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ভেসে থাকা পানির কণার ওপর আলো পড়ে তৈরি হয়, তাও তিনি এই কলেজের প্রথম বছরেই আবিষ্কার করলেন।

তেইশ বছর বয়সে নিউটন কলেজের পড়া শেষ করে গণিতের অধ্যাপক হলেন। কিন্তু পরের বছরই বিলেতে লাগল বিরাট রকম প্লেগের মড়ক। স্কুল-কলেজ সবই বন্ধ হয়ে গেল। কাজেই নিউটনও গ্রামে ফিরে গিয়ে তাঁর গবেষণার কাজে মন দিলেন। তাঁর মনে যত সমস্যা দেখা দিতে লাগল, গণিতের হিসেবে ফেলে তার সবকিছুর মীমাংসা করার চেষ্টা করতে লাগলেন। এই গ্রামে বসে বসে পঁচিশ বছর বয়স হবার আগেই নিউটন তাঁর সমস্ত যুগান্তকারী আবিষ্কারের ভিত দাঁড় করালেন।

গ্রহেরা কী করে সূর্যের চারদিকে ঘোরে, এ-প্রশ্নের মীমাংসা করতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন মহাকর্ষ তত্ত্বের।

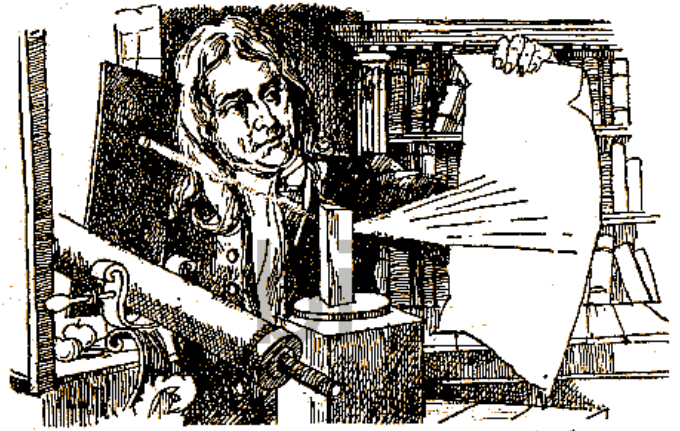

গল্প আছে, গাছ থেকে আপেল মাটিতে পড়তে দেখেই কথাটা তাঁর মাথায় এসেছিল। নিউটন ভাবলেন, গাছ থেকে আপেল যদি মাটিতে পড়ে তা হলে চাঁদ পৃথিবীতে না পড়ে শূন্যে ভেসে থাকে কী করে। তাঁর মনে হল, চাঁদকেও নিশ্চয়ই পৃথিবীটা আকর্ষণ করছে, কিন্তু চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে বলেই সেটা পড়তে পারছে না অর্থাৎ পৃথিবীর আকর্ষণটা কাটাকাটি হয়ে যাচ্ছে।

চাঁদ কত বেগে ঘুরলে পৃথিবীর আকর্ষণ কাটাকাটি হতে পারে নিউটন তা অঙ্ক কষে বের করলেন। আর আশ্চর্য! জ্যোতির্বিদরা চাঁদের ঘোরার যে-বেগ হিসেব করেছিলেন তার সঙ্গে তাঁর হিসেব হুবহু মিলে গেল। সবাই অবাক হয়ে দেখল নিউটনের মহাকর্ষের তত্ত্ব দিয়ে সারা বিশ্বের গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি হিসেব করা সম্ভব হয়ে উঠেছে।

আলোর দিকে ঝোঁক ছিল তাঁর বরাবর। আলো কী দিয়ে তৈরি—বাতির আলো, সূর্যের আলো, তারার আলো। নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করে তিনি আলো নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

গ্যালিলিও যে দূরবীন তৈরি করেছিলেন, তার কথা নিউটন জানতেন। দূরবীনের মধ্যে আলোর গতিবিধি তিনি গণিতের মাপজোকের সাহায্যে পরীক্ষা করলেন। তারপর এমন এক নতুন ধরনের দূরবীন তৈরি করলেন, যার মধ্যে পরকলা ছাড়াও রয়েছে আলো ঠিকরে দেবার জন্যে কাচের আয়না বসানো। দূরবীনটা ব্যাসে ছিল মাত্র এক ইঞ্চি, আর লম্বায় দু'ইঞ্চি। কিন্তু তাতে দূরের কোনো জিনিস দেখা যেত চল্লিশ গুণ বড়। এই দূরবীনের দিকে তাকিয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন বৃহস্পতির উপগ্রহদের। এরপর কাচের তেশিরা পরকল্যার সাহায্যে নিউটন দেখলেন সাদা আলোর মধ্যেই আছে সাতরঙা আলোর রঙধনু।

নিউটন ছিলেন খুবই সাদাসিধে রকমের মানুষ। সেকালের বিজ্ঞানীরা নতুন কিছু আবিষ্কার করলে সেটা সঙ্গে সঙ্গে লিখে প্রচার করতেন। কিন্তু নিউটনের এসব দিকে মোটেই মন ছিল না। নিত্য-নতুন আবিষ্কার নিয়ে তিনি এমন মশগুল থাকতেন যে, সেসব কথা লিখে ছাপাবার তাঁর ফুরসতই হত না।

নিউটন গবেষণার কাজে কেমন আপনভোলা হয়ে যেতেন, সে-সম্বন্ধে অনেক কাহিনী চালু আছে। একবার তাঁর বাড়িতে ছিল এক বন্ধুর খাবার নেমন্তন্ন। বন্ধু এসে দেখেন নিউটন বাড়ি নেই। টেবিলে একটা রান্না করা মুরগি ঢাকনা-চাপা দেওয়া রয়েছে। অপেক্ষা করতে করতে পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট করে দু'ঘণ্টা কেটে গেল। বন্ধুটি এত দেরি দেখে মুরগিটি খেয়ে ফেললেন। থালায় শুধু হাড়গোড়গুলো পড়ে রইল। শেষটায় নিউটন ফিরলে খাবারের ঢাকনাটা খুলে বললেন ঃ "আমি ভেবেছিলাম এখনও রাতের খাবার খাইনি। কিন্তু এখন দেখছি আগেই খেয়েছি।" তারপর দুই বন্ধুর মধ্যে শুরু হল দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক আলোচনার বৈঠক।

আইনস্টাইনকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, দুনিয়ায় এযাবৎ যত বিজ্ঞানী জন্মেছেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কে। আইনস্টাইন দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেছিলেন ঃ আইজাক নিউটন।

কিন্তু নিউটন নিজের সম্বন্ধে কী বলেছিলেন শুনবে? "লোকে আমার সম্বন্ধে কী ভাবে, তা আমি জানিনে। কিন্তু নিজের কাছে মনে হয় যেন আমি ছোট শিশুর মতো সাগরের তীরে শুধু নুড়িই কুড়িয়ে বেড়ালাম—কোথায় একটু মসৃণ নুড়ি অথবা একটু সুন্দর ঝিনুক। বিশাল জ্ঞানের সমুদ্র আমার সামনে অজানাই পড়ে রইল।"

বিজলি এলো হাতের মুঠোয়

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের কথা। ভারতবর্ষে তখনও বুদ্ধদেবের জন্ম হয়নি। দুনিয়ার সেরা সভ্য দেশ তখন ব্যাবিলনিয়া, মিসর আর গ্রীস।

আজ আমরা যাকে বলি তুরস্ক দেশ তার পশ্চিম উপকূলে সে-সময়ে মিলেটাস নামে এক সুন্দর ছোট বন্দর ছিল। এই মিলেটাস শহরে তখন দেখা দিলেন মস্ত এক পণ্ডিত লোক—নাম তাঁর থেলিস। থেলিসকে বলা হয় দুনিয়ার প্রথম বিজ্ঞানী—কেননা তিনি সব জিনিসের মধ্যে প্রকৃতির নিয়মকানুন খুঁজে বের করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে আমরা অনেক নতুন কথা জেনেছি।

থেলিসের হাতে পড়ল একদিন সমুদ্রের ধারে কুড়িয়ে পাওয়া ফিকে তামাটে রঙের এক অদ্ভুত রকমের পাথরের নুড়ি। আর এই নুড়ি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে এক আশ্চর্য জিনিস তাঁর চোখে পড়ল। তিনি দেখলেন, কোনোকিছু দিয়ে ঘষলে এই নুড়ির যেন হাত-পা গজিয়ে ওঠে। ছোট ছোট পাখির পালক বা খড়কুটোকে সে তখন কাছে টেনে নেয়। এই আশ্চর্য পাথরের গ্রীক নাম দিলেন তিনি 'ইলেকট্রন'। আজকাল এ-ধরনের পাথরকে বলা হয় 'অ্যাম্বার'।

এই অঞ্চলে সে-সময়ে এমনি আরও এক জাতের পাথর পাওয়া যেত—সেগুলো নিয়েও থেলিস নানারকমের পরীক্ষা করেছিলেন। এসব পাথরের আশ্চর্য গুণ এই যে, এরা ছোট ছোট লোহার জিনিসকে কাছে টেনে নিতে পারত। আজ অবশ্য সবাই বলবে যে, এই পাথর আর কিছু নয়—এ হল আসলে চুম্বক-লোহা। কিন্তু থেলিসের সময়ে এরা কী করে অন্য লোহাকে টেনে ধরে সেসব রহস্য কিছুই মানুষের জানা ছিল না।

থেলিস এই দু'জাতের পাথর দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে ভেবে বের করলেন চুম্বক-পাথর যে লোহাকে টেনে ধরে আর ঘষা 'ইলেকট্রন' পাথর যে ছোট ছোট পালক বা খড়কুটোকে আকর্ষণ করে, এই দুটো আকর্ষণ বুঝি আসলে একই। থেলিস ছিলেন সে-যুগের এক মস্ত পণ্ডিত। সেকালের লোকেরা যেসব বিষয়ে কিছুই জানত না, দুনিয়ার এরকম অনেক রহস্যের তিনি কিনারা করেছিলেন। কিন্তু এখানে তিনি আসল ব্যাপারটা ধরতে পারলেন না। এমনকি থেলিসের পরে আরও বাইশ শো বছরের মধ্যেও তাঁর ও-ভুল আর ধরা পড়েনি।

ধরা পড়ল শেষ পর্যন্ত ১৬০০ সালের দিকে। ইংলণ্ডের রানি প্রথম এলিজাবেথ কেবলই সিংহাসনে বসেছেন। অল্পদিন হল পশ্চিম আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কৃত হয়েছে—চারদিকে লোকেরা নতুন জগতের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে। এমনি সময়ে মহারানি এলিজাবেথের রাজবৈদ্য ডাক্তার উইলিয়ম গিলবার্ট একখানা বই লিখলেন ; আর তার নাম দিলেন 'চুম্বকের কথা'।

এই বইতে গিলবার্ট কতকগুলো একেবারে আনকোরা নতুন কথা বললেন। যেমন তিনি বললেন, আমাদের গোটা পৃথিবীটাই হচ্ছে মস্ত বড় এক

চুম্বক—সাধারণ লোহার চুম্বকে যেমন উত্তর-দক্ষিণ দুটো মেরু থাকে, পৃথিবীর চুম্বকেরও তেমনি দুটো মেরু আছে। তা ছাড়া তিনি আরও বললেন, কাচ, চুনি-পান্না, অ্যাম্বার এসব পাথরকে ঘষলে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়।

এরকম বিদ্যুৎ ঘরে বসেও তৈরি করা যায়। একটা লম্বা কাচের কাঠি এক টুকরো রেশমি কাপড় দিয়ে ঘষে কতকগুলো ছোট ছোট টুকরো কাগজের ওপর নিয়ে ধরো; দেখবে, কাগজের টুকরোগুলো লাফিয়ে কাচের গায়ে লেগে যাচ্ছে।—ঠিক যেমন চুম্বক-লোহা ছোট ছোট লোহার পিনকে টেনে ধরে। শীতের দিনে শুকনো চুলে চিরুনি চালিয়েও এই পরীক্ষাটা করা যায়।

কিন্তু কাচের কাঠি বা চিরুনি কাগজের টুকরোকে আকর্ষণ করে কিছু দিয়ে ঘষলে তার পরে, অথচ চুম্বক-লোহা যে আকর্ষণ করে সে তো আপনা থেকেই। এই মস্ত বড় তফাতটা থেলিসের চোখে ধরা পড়েনি। এটা ধরা পড়ল গিলবার্টের কাছে। থেলিস অ্যাম্বার পাথরের গ্রীক নাম দিয়েছিলেন ইলেকট্রন ; সেই থেকে যেসব জিনিসকে ঘষলে তারা অন্য জিনিসকে আকর্ষণ করে, গিলবার্ট তাদের নাম দিলেন ইলেকট্রিক্‌স্—আর ঘষলে এদের মধ্যে আকর্ষণ করার যে-শক্তি জন্মায় তাকে বললেন 'ইলেকট্রিক' শক্তি।

গিলবার্ট এমনি করে কয়েক রকমের ধাতুকে ঘষে ঘষে দেখলেন তাতে অ্যাম্বারের মতো আকর্ষণ করবার শক্তি জন্মায় না; তাই তিনি ভেবে নিলেন ওসবে বিদ্যুৎ হয় না। গিলবার্ট কিন্তু কখনো বুঝতে পারেননি যে, আসলে ধাতুর গায়ে যে-বিদ্যুৎ হয় তা ওর ভেতর দিয়ে চলে যায়। চলাচল করতে পারে এরকম বিদ্যুতের কথা কখনো তাঁর মনেই জাগেনি। কেননা, তিনি ধরে নিয়েছিলেন বিদ্যুৎ হল একটা স্থির জিনিস।

১৭২৯ সালে স্টীফেন গ্রে নামে এক ইংরেজ বিজ্ঞানী আবার গিলবার্টের অনেক ধারণাকে দিলেন পালটে। তিনিই প্রথম দেখালেন, ঘষলে বিদ্যুৎ জন্মায় সব-কিছুতেই। গিলবার্ট যেসব ধাতুর ভেতর বিদ্যুৎ জন্মায় না বলেছিলেন, আসলে তারা বিদ্যুৎ তাড়াতাড়ি বয়ে নিতে পারে—বলা যায় 'বিদ্যুতের পরিবাহক'। আর যাদের

তিনি বলেছিলেন 'ইলেকট্রিক', আসলে তাদের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে না ; এক জায়গায় জমে থাকে।

কিন্তু সেই বিদ্যুৎ জিনিসটা কেমন? কী করে তা এক জায়গায় জমে থাকে, আর কী করেই-বা নানা জায়গায় জলাফেরা করে? দু-ফে নামে এক ফরাসি বিজ্ঞানী এর রহস্য ভেদ করতে গিয়ে বার করলেন, বিদ্যুৎ আসলে দু'জাতের—পজিটিভ আর নিগেটিভ ; হ্যাঁ-ধর্মী আর না-ধর্মী! ভিন্ন দু'জাতের বিদ্যুৎ পরস্পরকে কাছে টেনে নেয়, আর একই জাতের বিদ্যুৎ পরস্পরকে দূরে ঠেলে দেয়।

তার পরে আমেরিকার বিজ্ঞানী বেনজামিন ফ্র্যাংকলিন এই পজিটিভ আর নিগেটিভ বিদ্যুৎ নিয়ে অনেক পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি বললেন, সব বিদ্যুৎই গোড়ায় খুব খুদে খুদে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ দিয়ে তৈরি। তিনি যাকে বলেছিলেন বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ বা কণা, আজ আমরা তাকে বলি ইলেকট্রন (বা বিদ্যুতিন) আর প্রোটন।

ফ্র্যাংকলিন আরও একটা খুব দামি কথা বলেছিলেন। সে হল, বিদ্যুৎকে আসলে তৈরিও করা যায় না, ধ্বংসও করা যায় না, বিশ্বজগতে মোট বিদ্যুতের পরিমাণ সব সময়ে একই থাকে। তবে এই বিদ্যুতের একটা অংশকে আমরা কোনো কায়দায় (যেমন, ঘষে) এক জায়গায় জড়ো করতে পারি, কিংবা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঠেলে পাঠিয়ে দিতে পারি। বিদ্যুৎ যখন জড়ো হয় তখন তাকে বলে স্থিরবিদ্যুৎ, আবার যখন একদিকে ঠেলে দেওয়া হয় তখন তা হয় চলবিদ্যুৎ বা বিদ্যুতের প্রবাহ। আর এই বিদ্যুতের প্রবাহ হল শক্তি—একে দিয়ে অনেক কাজ করানো যায়।

আকাশে যে বিজলি চমকায় সে-বিদ্যুৎ আর ঘরে ঘরে তৈরি করা বিদ্যুৎ যে একই জিনিস একথাও ফ্র্যাংকলিন প্রথম প্রমাণ করেন। তিনি দেখালেন, হাওয়ার সঙ্গে মেঘের জলকণার ঘষা লেগেই মেঘে বিজলি তৈরি হয়। ১৭৫২ সালের এক ঝোড়ো রাতে ফ্র্যাংকলিন উড়িয়ে দিলেন রেশমি কাপড়ে তৈরি এক ঘুড়ি, আর তার রেশমি সুতোর শেষ প্রান্তে থাকল একটা লোহার চাবি। মেঘে বিজলি চমকাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুড়ি থেকে ভেজা সুতো বেয়ে নেমে এল বিদ্যুতের প্রবাহ আর সুতোয় বাঁধা চাবি থেকে পাওয়া গেল বিদ্যুতের ঝলক।

ফ্র্যাংকলিনের কপাল ছিল বেজায় রকম ভাল। তিনি বুঝতে পারেননি কী মারাত্মক পরীক্ষা তিনি করেছেন। এর পরে যে-দু'জন এই পরীক্ষাটি করতে গিয়েছিলেন তাঁদের দু'জনকেই বিদ্যুতের প্রবল ঝলকে প্রাণ দিতে হয়। ফ্র্যাংকলিন কী করে বেঁচে গিয়েছিলেন তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। কিন্তু আকাশের প্রচণ্ড বজ্রকে জয় করে তিনিই প্রথম আনলেন মাটিতে।

আকাশের বাজ আর বিজলির বুকে থাকে যে-প্রচণ্ড শক্তি তা এল মানুষের হাতের মুঠোয়। এর পর বিজলিকে আয়ত্ত করল মানুষ কয়লা আর বাষ্পের শক্তি থেকে, তেল আর নদীর উদ্দাম প্রবাহ থেকে। আর এই শক্তিকে মানুষ ক্রমে ক্রমে কাজে লাগাল—সারা পৃথিবীকে আর মানুষের সভ্যতাকে নতুন করে গড়ে তোলার কাজে।

ব্যাঙ-নাচানো বিজ্ঞানী

আকাশে মেঘের রাজ্যে থাকে একটা ভীষণ দৈত্য, —তার নাম বিজলি। বর্ষার মেঘে মেঘে সে যখন কড় কড় করে ডাকে, বত্রিশ পাটি দাঁতে আগুনের ঝিলিক মেরে ভেংচি কাটে, তখন ভয়ে মানুষের বুক শুকিয়ে আসে; মনে হয় এবার বুঝি সে সারা দুনিয়াটা ভেঙেচুরে তছনছ করে ফেলবে।

কিন্তু একদিন কী কৌশলে এই দৈত্যকে মানুষ বন্দি করে পোষ মানিয়ে ফেলে। —তার পর থেকে রোজ সে মানুষের ঘরে ঘরে আলো দেয়, পাখা ঘোরায়, কলকারখানায় হাজারে হাজারে তার দরকার মতো জিনিস তৈরি করে, টেলিগ্রাফ-টেলিফোন-রেডিও দিয়ে সারাটা দুনিয়াকে তার হাতের মুঠোয় এনে হাজির করে।

এত শক্তি যে-দৈত্যের তাকে বশ করবার মন্ত্র মানুষ শিখল কী করে?

শুনলে অবাক হবে, মন্ত্রতন্ত্র কিছু নয়, এর মূলে আছে খুবই হঠাৎ, খুব ছোট্ট একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার; আর সে-আবিষ্কারটা করেছেন এক ব্যাঙ-নাচানো বৈজ্ঞানিক।

আজ থেকে প্রায় দু'শো বছর আগে ইতালিতে এক ডাক্তার ছিলেন। ইতালির বলোনিয়া (Bologna) শহরে ডাক্তারি পড়ান—নাম তাঁর লুইজি গ্যালভানি (Luigi Galvani)। ডাক্তারদের কাটাছেঁড়া করার অভ্যেস, সে তোমরা জান। গ্যালভানিও আপনমনে নানারকম জন্তু-জানোয়ার, পোকামাকড় কেটেকুটে পরীক্ষা চালাতেন।

একদিন তিনি এমনি একটা ব্যাঙকে কাটাকুটি করে টেবিলের ওপর রেখে অন্য কাজে মন দিয়েছেন। তাঁর একজন সহকারী একটা ছোট ছুরি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে অন্যমনস্কভাবে সে-ব্যাঙের পায়ে ছুঁয়ে দিলেন। হঠাৎ ভৌতিক কাণ্ড, সঙ্গে সঙ্গে পা-টা লাফিয়ে নড়ে উঠল। মরা, ছেলা ব্যাঙের ঠ্যাংকে এভাবে লাফিয়ে উঠতে দেখে তিনি ভো বেজায় চমকে গিয়ে গ্যালভানিকে ডাকলেন। গ্যালভানিও আবার ছুরির ডগাটা ছোঁয়ালেন, আবার তেমনি পা-টা কুঁচকে নড়ে উঠল।

এই ভুতুড়ে ব্যাপারটা যেন এর পর থেকে গ্যালভানিকে একেবারে পেয়ে বসল। যেখানে-সেখানে নানানভাবে তিনি মরা ব্যাঙ ছিলে ছিলে ঝোলালেন; নানা অবস্থায় নানান ধাতুর জিনিস দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ব্যাঙ-নাচানো যেন তাঁর একটা নেশা হয়ে দাঁড়াল।

তখনকার দিনের বিজ্ঞানীরা স্থিরবিদ্যুৎ বলে একটা জিনিসের কথা জানতেন। কোনো কোনো জিনিসের সঙ্গে আর কোনো জিনিস ঘষলে (যেমন, কাচের গায়ে রেশম, কিংবা এবোনাইটের গায়ে পশম) এমনি সামান্য স্থিরবিদ্যুৎ তৈরি হয়। গ্যালভানি প্রথমটায় ভেবেছিলেন, তাঁর ঘরে যে একটা স্থিরবিদ্যুৎ তৈরির যন্ত্র আছে, তাই থেকে সামান্য বিদ্যুৎ লাফিয়ে এসে পড়ে ব্যাঙের পা-টাকে ওভাবে নাচাচ্ছে।

কিন্তু দেখা গেল, বাইরে বাগানের লোহার শিকে যে-ব্যাঙটা ঝোলানো ছিল, সেটাও ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে একইভাবে লাফিয়ে উঠল।

তখন তিনি তাঁর মত পালটে বললেন, আকাশে বিজলি চমকাক বা না চমকাক, বাতাসে সব সময় কিছু-কিছু বিদ্যুৎ ভেসে বেড়ায়, আর সেগুলো সব গিয়ে জমে ওই ব্যাঙের শরীরে; তারপর কোনো কোনো ধাতব জিনিস দিয়ে ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিদ্যুৎ বেরিয়ে আসে, তাতেই পা-টা অমন করে লাফিয়ে ওঠে।

কিন্তু এ-মতও গ্যালভানিকে শিগ্‌গিরই পালটাতে হল। একটা ব্যাঙের শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে পেতলের হুক পরিয়ে সেটাকে তিনি টাঙিয়েছিলেন বাগানের লোহার রেলিং-এর সঙ্গে। নানারকম পরীক্ষা করতে করতে এক সময়ে পেতলের হুকের দু'টো মাথা বাঁকিয়ে নিয়ে ছোঁয়ালেন রেলিং-এর গায়ে আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙটা জোরে লাফিয়ে উঠল। পরীক্ষাটা বাইরে থেকে ঘরের মধ্যে নিয়ে করেও সেই একই ফল পাওয়া গেল।

এ থেকে তিনি বুঝলেন, বাতাসের বিদ্যুৎটা মোটেই আসল ব্যাপার

নয়—আসল ব্যাপার হল দুটো আলাদা ধাতু দিয়ে ব্যাঙটাকে ছোঁয়া; তা হলেই ব্যাঙের গা থেকে বেশি বিদ্যুৎ বেরিয়ে আসে।

তখনও কিন্তু গ্যালভানি ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেননি। তিনি ছিলেন ডাক্তার মানুষ; তাই মনে করলেন, স্থিরবিদ্যুতের মতো ব্যাঙের গায়ের ভেতর একরকমের বিদ্যুৎ আছে যাকে বলা যায় জৈববিদ্যুৎ (animal electricity)। দুটো ধাতু দিয়ে ছুঁলে গা থেকে ওই জৈববিদ্যুৎ মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে আসে।

কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে না পারলেও গ্যালভানি ঘটনাচক্রে যা আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন তা হল মানুষের তৈরি প্রথম বিদ্যুতের প্রবাহ আর বৈদ্যুতিক ব্যাটারি। ভেজা ব্যাঙের গা, আর তার গায়ে লাগানো দুটো ভিন্ন রকমের ধাতু—এই নিয়ে হল ব্যাটারি; আর বিদ্যুৎপ্রবাহের প্রমাণ দিচ্ছে ব্যাঙের মাংসপেশির কুঁচকে লাফিয়ে ওঠা। এভাবে যে সত্যি সত্যি বিদ্যুৎ তৈরি হয়, তা তোমরা নিজেরাও একটা খুব সহজ পরীক্ষা করে দেখতে পার:

একটা তামার পয়সা আর একটা রুপোর আধুলি ভাল করে ধুয়ে নিয়ে জিবের ওপরে-নিচে রাখো; তারপর দুটোকে একসাথে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দাও। দেখবে জিবে কেমন একটা 'স্বাদ' পাওয়া যাচ্ছে। দুটো ধাতুর খণ্ড আর জিবের ভেতর দিয়ে খুব সূক্ষ্ম একটা বিদ্যুতের প্রবাহ বয়—জিবের স্নায়ুতে ওই স্বাদের অনুভূতিটা হল তার প্রমাণ। এখানে জিব যেমন বিদ্যুতের অস্তিত্বের প্রমাণ দিচ্ছে, গ্যালভানির ব্যাঙের পা-ও ঠিক তা-ই দিয়েছিল।

যাই হোক, গ্যালভানি বিদ্যুৎপ্রবাহ আবিষ্কার করলেও তার সত্যিকার ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। সে-ব্যাখ্যা দিয়েছেন বছর পনেরো পরে ইতালির আর একজন বিজ্ঞানী, নাম তাঁর আলেসান্দ্রো ভোল্টা (Alessandro Volta)।

ভোল্টাও প্রথমটায় গ্যালভানির জৈববিদ্যুতের কথাই মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু তার পরে বিদ্যুৎ মাপবার একটা সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কার করে তা-ই দিয়ে পরীক্ষা চালাতে গিয়ে তিনি দেখলেন, আসলে বিদ্যুৎ তৈরির জন্যে ব্যাঙের পা-টা জরুরি জিনিস মোটেই নয়। তার বদলে যে-কোনো ভেজা জিনিস ব্যবহার করলেই চলে। দেখা গেল নুন বা ক্ষার-মেশানো ভেজা জিনিস হলে কাজ আরও ভাল হয়।

পরপর একটা তামার পাত, একটা দস্তার পাত, আর তার গায়ে লাগানো নুনের পানিতে ভেজা একটা মোটা কাগজের চাকতি—তারপর আবার এমনি তামার পাত, দস্তার পাত, নুনের পানিতে ভেজানো চাকতি—এভাবে ২০, ৩০ বা ৪০ বার গায়ে গায়ে সাজিয়ে ভোল্টা তাঁর প্রথম ব্যাটারি তৈরি করলেন। এর পজিটিভ নিগেটিভ দু মাথাকে তার দিয়ে জুড়ে দিয়ে মানুষের হাতে প্রথম দীর্ঘস্থায়ী বিদ্যুতের প্রবাহ সৃষ্টি হল। এ বিদ্যুতের তেজ খুব বেশি নয়, কিন্তু পরিমাণ যথেষ্ট, এ থেকে ধীরে ধীরে অনেকটা বিদ্যুৎ পাওয়া যায়।

এতদিন স্থিরবিদ্যুৎ-যন্ত্রে ক্রমে ক্রমে জমে ওঠা বিদ্যুতের যে স্পার্ক বা স্ফুলিঙ্গ পাওয়া যেত তার তেজ বেশি, কিন্তু পরিমাণ খুব সামান্য; তাই সে বিদ্যুৎকে কোনো কাজে লাগানো যেত না। ভোল্টার ব্যাটারি থেকেই বিজলির প্রবাহকে প্রথম

মানুষের কাজে খাটানো সম্ভব হল।

অবশ্য এটা কেবল শুরু। তারপর ক্রমে ক্রমে বিজলি তৈরির ব্যবস্থার আরও অনেক উন্নতি হয়েছে। আজকাল ব্যাটারির বিদ্যুৎ শুধু ছোটখাট কাজের জন্যেই ব্যবহার করা হয়—ভারী কাজের বিদ্যুৎ তৈরি হয় ডায়নামো থেকে। বিজলির ব্যবহারও আজ আমাদের জীবনের সবদিকে ছড়িয়ে পড়েছে; আজকের দিনে বিজলি মানুষের এতরকম কাজ দিচ্ছে যা গ্যালভানি বা ভোল্টা কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না।

সভ্যতার এই অগ্রপথিকদের দানের কথা কিন্তু বিজ্ঞান ভোলেনি। সেই ব্যাঙ-নাচানো বিজ্ঞানীর নাম থেকে চল-বিদ্যুতের নাম হয়েছে গ্যালভানির বিদ্যুৎ; ভোল্টার নাম থেকে আজও বিজলির চাপের মাপ হচ্ছে 'ভোল্ট' দিয়ে; আর বিজলির সূক্ষ্ম প্রবাহ মাপবার যন্ত্রের নাম 'গ্যালভানোমিটার'।

bi

ডারউইনের অভিযান

যে-ছেলের বাপ আর দাদা দু'জনেই নামজাদা ডাক্তার তার যে ডাক্তারির দিকে টান হবে তা সহজেই বোঝা যায়। ডারউইনের বেলাও সবাই ভেবেছিল তা-ই। কিন্তু আদতে সবার এ-অনুমান ফলল না। ডারউইন ডাক্তার হলে হয়তো তাঁর আব্বার মতো টাকা করতেন অনেক। কিন্তু সারা দুনিয়ার মানুষের মনে তাঁর নাম যেমন চিরদিনের মতো খোদাই হয়ে গিয়েছে, এমনটি হত কি না সন্দেহ।

১৮০৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ইংল্যাণ্ডের শ্রুসবেরি বলে একটি জায়গায় চার্লস ডারউইনের জন্ম হয়। ঠিক এই একই দিনে আমেরিকায় আর একজন বিখ্যাত লোক জন্মেছিলেন—তাঁর নাম আব্রাহাম লিংকন।

বারো বছরের ছেলে ডারউইন। তার কেবলই ইচ্ছে করত বাইরে বাইরে ঘুরে প্রকৃতির সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার। হরেক রকম গাছগাছড়ার নমুনা যোগাড় করার। নানান ধরনের পোকামাকড়, জীবজন্তুর চালচলন লক্ষ করার। এমন কৌতূহলী মন যার তার কি বোর্ডিং-স্কুলের বদ্ধ খাঁচায় ভাল লাগবে?

সেকালে এমনকি বিলেতের স্কুলগুলোতেও বিজ্ঞান শেখাবার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। সেখানে শেখানো হত শুকনো ব্যাকরণ, কাব্যতত্ত্ব—এমনি নানারকম কেতাবি বিষয়। এসব একটুও ভাল লাগত না ডারউইনের—তার মন পড়ে থাকত বাইরে। তাই পরীক্ষার ফল হত খারাপ।

এসব কথা ডারউইনের আব্বার কানে পৌঁছত। একদিন তিনি রেগেমেগে ছেলেকে চিঠিতে লিখলেন: শিকার করা, কুকুর পোষা আর ইঁদুর ধরা—এ ছাড়া কোনদিকেই তোমার মন নেই। তুমি তোমার নিজের আর পরিবারের সবার মুখে কালি দেবে, আমি তা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি।

আব্বা ঠিক করেছিলেন ডারউইনকে তাঁর নিজের মতোই ডাক্তার বানাতে হবে। তাই তাঁকে ষোলো বছর বয়সে একটা ডাক্তারি স্কুলে ভরতি করে দেওয়া হল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেল ডাক্তারি পড়ায় তাঁর মোটেই উৎসাহ নেই। তার চেয়ে বরং তাঁর ঝোঁক ছিল প্রায়ই ছেলেদের সাথে সমুদ্রে নেমে পড়ায়। সেখান থেকে নানারকম সামুদ্রিক জীব সংগ্রহ করে তাদের তিনি পরীক্ষা করে দেখতেন। তা ছাড়া কেমব্রিজে ছাত্র-অধ্যাপক মিলে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের এক সমিতি ছিল। তার বৈঠকে তিনি গভীর আগ্রহ নিয়ে নিয়মিত যোগ দিতেন।

বছর দু'-তিন দেখার পর একেবারে নিরুপায় হয়েই তাঁর আব্বা তাঁকে ভরতি করে দিলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এবার আর ডাক্তার নয়—পাদরি বানাবার জন্যে। ডারউইন যে কী করে এতে রাজি হলেন সেটা বোঝা শক্ত। হয়তো ভেবেছিলেন, কী আর এসে যায়? যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন। তবে তাঁর ঝোঁক থাকল আগের মতোই। শিকার করা, বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে বই পড়া, বৈজ্ঞানিক সভায় যোগ দেওয়া, বনজঙ্গলে পোকামাকড় সংগ্রহ করে বেড়ানো—এইসব নিয়েই মেতে থাকলেন তিনি।

তা বলে পাদরি হবার জন্য ধর্মতত্ত্বের ক্লাসে কি তিনি যেতেন না? হ্যাঁ, তাও যেতেন বইকী! পরীক্ষা পাশও করলেন। পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে মস্ত বড় একটা কাজের সুযোগও জুটে গেল। পাদরি হবার? না, তা নয়। বীগল্ (Beagle) নামে একটা জাহাজ সে-সময় পৃথিবীর নানা সমুদ্রে সফরে বেরুচ্ছিল। উদ্দেশ্য হল ইংরেজ সওদাগরদের জন্যে নানা দেশে যাবার রাস্তা বের করা আর বাণিজ্যের সুবিধে করে দেওয়া।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক হেন্‌সলো ডারউইনের অদ্ভুত খেয়ালের কথা ভাল করে জানতেন, আর তাঁকে ভালও বাসতেন খুব। তিনি ডারউইনকে লিখলেন ঃ বীগল্ জাহাজে একজন প্রকৃতিবিজ্ঞানী চায়। কোনো মাইনে-টাইনে নেই, তবে ক্যাপ্তান তাঁর কামরার খানিকটা জায়গা ছেড়ে দেবেন। এতে গেলে নানান দেশবিদেশ থেকে তোমার অনেক কিছু দেখার জানার সুবিধে হবে। —ডারউইন অমনি রাজি হয়ে গেলেন।

কিন্তু শুধু ডারউইন রাজি হলেই তো হবে না! তাঁর আব্বা একেবারে বেঁকে বসলেন ঃ এরকম বেয়াড়া রকম খামখেয়ালিতে জীবনটা নষ্ট করে দেবার কি কোনো অর্থ হয়? শেষমেষ তাঁর চাচা আব্বাকে অনেক বুঝিয়ে কোনোমতে রাজি করালেন। কিন্তু তবু ডারউইনের এই চাকরিটা একটুর জন্যে হারাবার মতো অবস্থা হয়েছিল। বীগল্ জাহাজের ক্যাপ্তান ভো ডারউইনের চেহারা দেখেই বেঁকে বসলেন। তাঁর ধারণা ছিল লোকের নাক দেখেই তার চরিত্র বোঝা যায়। ডারউইনের নাকটা ছিল আবার একটু বোঁচা। ক্যাপ্তান বললেন ঃ উহুঁ, এরকম কাজের জন্যে যে-পরিমাণ উদ্যম আর সংকল্প থাকা দরকার তা এর থাকতে পারে না। একে দিয়ে কোনো কাজ হবে না।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ডারউইনের যাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক হল। পরে অবশ্য জাহাজের ক্যাপ্তান স্বীকার করেছেন নাকের ব্যাপারে তাঁর গোঁড়ামিটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল।

বীগল্ জাহাজ ইংরেজ সওদাগরদের কতখানি কাজ দিয়েছিল, এই সফরে বাণিজ্যের কতখানি উপকার হয়েছিল তা আজ আর কেউ মনে রাখেনি। কিন্তু এই জাহাজে পাঁচ বছরের সফরে ডারউইন যে-জ্ঞান সংগ্রহ করেছিলেন তা মানুষের চিন্তার মোড় সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিয়েছে। এই জাহাজের অভিযানেই ডারউইন তাঁর যুগান্তকারী ক্রমবিকাশ-তত্ত্বের মালমসলা আর সূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন।

১৮৩১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে বিলেতের প্লিমাউথ বন্দর থেকে জাহাজ

ছাড়ল। ডারউইনের বয়স তখন মাত্র বাইশ বছর। ডারউইনকে এই জাহাজে লম্বা পাঁচটা বছর কাটাতে হয়েছিল। এক দেশ থেকে আরেক দেশে, এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে জাহাজ যায়। আর যেখানেই যান সেখানেই ডারউইন সংগ্রহ করেন নানারকম গাছপালা, পাথর, জীবজন্তুর হাড়, পাথরে ছাপপড়া জীবজন্তুর মূর্তি—যাকে বলে 'ফসিল'। নানা দেশের গাছপালা, জীবজন্তু দেখে দেখে তাদের সম্বন্ধে খাতায় লিখে রাখেন সব কথা। ভরে ওঠে পাতার পর পাতা।

ডারউইন যতই দুনিয়ার নানা দেশ থেকে বেশি করে তথ্য সংগ্রহ করেন ততই সবরকম গাছপালা জীবজন্তুর জন্মরহস্য সম্বন্ধে একটা সত্য তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। একটা দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর মনের মধ্যে গেড়ে বসে ঃ গাছপালা

জীবজন্তুর নানা জাত সবই একসঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে সৃষ্টি হয়েছে একথা সত্যি নয়, সত্যি হতে পারে না। বিভিন্ন রকম জাতের মধ্যে নানান আশ্চর্য মিল তাঁর চোখে পড়তে থাকে।

ঘুরতে ঘুরতে তিন বছর পরে বীগল্ জাহাজ এসে পৌঁছয় দক্ষিণ আমেরিকায়। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল গালাপাগোস নামে একটি দ্বীপপুঞ্জ আছে। বিষুব রেখার ওপরে ডজনখানেক দ্বীপ, মূল মহাদেশ থেকে প্রায় ৬৫০ মাইল দূরে। বীগল্ নোঙর করল এখানকার কয়েকটা দ্বীপে। আর ডারউইন খুব অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ করলেন। তিনি দেখলেন, যদিও দ্বীপগুলোর ওপরকার গাছগাছড়া আর জীবজন্তু অনেকটা আসল মহাদেশের ওপরকার গাছগাছড়া, জীবজন্তুর মতোই, তবু তাদের বেশির ভাগই পৃথক জাতের। আবার এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপেও এদের মধ্যে যথেষ্ট তফাত রয়েছে।

ডারউইন দেখলেন, গালাপাগোসের এক দ্বীপের পাখি আরেক দ্বীপের পাখির মতো প্রায় একরকমের হলেও একেবারে সম্পূর্ণ এক নয়। তাদের রঙে, তাদের গানে, তাদের বাসা বানাবার কায়দায়, তাদের ডিমে নানান ধরনের খুঁটিনাটি তফাত রয়েছে। তিনি এসব দ্বীপের ওপর থেকে ২৩ রকমের পাখি সংগ্রহ করলেন যার একটাও মহাদেশের ওপর দেখা যায় না।

বিশেষ করে চোখে পড়ল তাঁর বিভিন্ন দ্বীপে বিভিন্ন রকমের ফিঙে। কোনোটার ঠোঁট সরু, কোনোটার মোটা, কোনোটার বাঁকা। কেউ খায় ছোট বীজ, কেউ বড় বীজ, আবার কেউ-বা বাঁচে পোকামাকড় খেয়ে। দ্বীপগুলোতে তিনি পেলেন ১৪ জাতের ফিঙে। এর একটারও মূল মহাদেশে দেখা পাওয়া যায় না। তাঁর কাছে মনে হল নিশ্চয়ই সুদূর অতীতে মূল মহাদেশ থেকেই দু'-একটি ফিঙে এখানে এসেছিল। তারপর বিভিন্ন দ্বীপে বিভিন্ন রকম পরিবেশে পড়ে তাদের মধ্যে যুগ যুগ ধরে নানা পরিবর্তন দেখা দেয়। কোনোটা খেতে শুরু করে এক ধরনের বীজ, কোনোটা বা আরেক ধরনের বীজ। বিভিন্ন ধরনের জীবনযাত্রার ফলে ক্রমে ক্রমে তাদের গড়ন বদলে যেতে থাকে, তৈরি হয় নানানরকম ঠোঁট—আলাদা আলাদা জাত।

ডারউইন আরও লক্ষ করলেন, গালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে বিরাট বিরাট রাক্ষুসে কাছিম আছে—তার এক-একটা এত বড় যে ঝুলিয়ে বয়ে নিতে হলে আটজন জোয়ান মরদের দরকার। আর সবচেয়ে বড় আশ্চর্য হচ্ছে, সেখানকার লোকেরা কাছিমের চেহারা দেখেই বলে দিতে পারে কোনটা কোন দ্বীপের। এইসব মিল-গরমিলের নিশ্চয়ই কিছু একটা মানে আছে। ডারউইন এ-সময়ে তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন ঃ আমি ক্রমেই বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাচ্ছি!

তিনি যতই অবাক হতে লাগলেন আর লক্ষ করতে লাগলেন ততই তাঁর কাছে মনে হতে লাগল, এই ধাঁধার একটাইমাত্র জবাব আছে। এইসব গাছ-গাছড়া আর জীবজন্তুর যদি একই ধরনের সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে জন্ম হয়ে থাকে তা হলে খুব সহজেই এদের মিল-গরমিলের মানে খুঁজে পাওয়া যায়। মূল মহাদেশ থেকে সুদূর অতীতে যে-দু'-একটি পূর্বপুরুষ বিভিন্ন দ্বীপে গিয়ে পড়েছিল, যুগ যুগ ধরে তারা বদলাতে বদলাতে ক্রমে ক্রমে একে অন্য থেকে একেবারেই আলাদা হয়ে পড়েছে।

বলা বাহুল্য, একদিনে এসব পরিবর্তন আসেনি, এসেছে হাজার হাজার বছর ধরে ধীরে ধীরে। গালাপাগোসের দ্বীপগুলি মহাদেশ থেকে দূরে বলেই প্রকৃতির এই পরীক্ষাশালায় মানুষের অগোচরে ঘটেছে নানারকম জাতের এই বিচিত্র সমাবেশ।

বীগল্ জাহাজ দর্গম, রুক্ষ, গালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে কাটিয়েছিল মাত্র পাঁচ হপ্তা। ডারউইন লিখেছেন ঃ এই পাঁচ হপ্তা আমার জীবনের সবচাইতে স্মরণীয় কাল।

বিলেতে ফিরে ডারউইন তাঁর ধারণাগুলি জড়ো করে নোট লিখে চললেন বিশ বছর ধরে। একটার পর একটা নোটবই ভরতি করে যাচ্ছেন। প্রাণিজগৎ সম্বন্ধে যেখানে যত নতুন তথ্য পাচ্ছেন সব জড়ো করছেন। এইসব তথ্য থেকে তিনি প্রমাণ করলেন ঃ সবরকমের জীবদেহ—সে গাছই হোক আর জন্তুই হোক—সাধারণ পূর্ব-পুরুষ থেকে জন্মেছে। এক জাত থেকে বংশে বংশে বদলে কী করে একেবারে অন্য জাত সৃষ্টি হয় তাও ডারউইন প্রমাণ করলেন।

কী বললেন তিনি?

ডারউইন বললেন, ধরা যাক একটা প্রাণীর কথা। একই প্রাণীর সন্তানসন্ততির মধ্যে কিছুটা স্বাভাবিক ব্যতিক্রম থাকেই। যেসব ব্যতিক্রম তাকে পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করতে সাহায্য করে সেগুলো বংশধরদের মধ্যে টিকে যায়। বাকিগুলো টেকে না; সেসব ব্যতিক্রমওয়ালা বংশধর লুপ্ত হয়ে যায়। আজকের মতো এমন লম্বা গলাওয়ালা জিরাফ চিরকাল ছিল না। জিরাফের মধ্যে কারও কারও হয়তো ছিল কিছুটা লম্বা গলা। তারা বন-জঙ্গলে গাছের ওপর থেকে বেশি পাতা খেয়ে শক্ত-সমর্থ হল বেশি, কাজেই বেশি বংশধরও রেখে গেল। তাদের বংশধররাও কিছুটা পেল বাপ-মায়ের লম্বা গলার আদল। এমনি করে ধীর ধীরে লম্বা গলাওয়ালা জিরাফের সংখ্যা বাড়তে থাকল। খাটো গলা যাদের তারা পাতা খেতে পেল কম, তাই প্রতিযোগিতায় টিকল না; ক্রমে ক্রমে তাদের সংখ্যা কমতে লাগল। ডারউইন একে বলেছেন 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'।

এ-ধরনের ক্রমবিকাশ শুধু যে প্রকৃতিতে আপনা-আপনি হয় তা নয়। মানুষ আপন প্রয়োজনমতো এই পরিবর্তনের ধারাকে কাজে লাগাতে পারে। এই ক্রমবিকাশের ধরনকে কাজে লাগিয়েই মানুষ সৃষ্টি করেছে এমন জাতের পোষা গরু যার দুধ বেশি হয়, মাংস বেশি হয়; এমন জাতের ঘোড়া যা আকারে বড় হয় আর জোরে ছুটতে পারে। এমনি আরও নানারকম প্রাণী আর গাছপালা।

প্রকৃতির এমন একটি সাধারণ নিয়ম এর আগে আর কেউ এত সুন্দর করে প্রকাশ করতে পারেননি। ডারউইন কী করে এমন আশ্চর্য সাফল্য লাভ করলেন?

তাঁর সাফল্যের মোটামুটি দু'টি কারণ আছে। প্রথমত, তিনি বিপুল পরিমাণ ঘটনা ও তথ্য যোগাড় করেছিলেন যা দিয়ে আগাগোড়া ব্যাপারটা সকলের চোখের সামনে ছবির মতো ঝকমকে করে তুলে ধরা যায়। দ্বিতীয়ত, শুধু ক্রমবিকাশ হয় একথা বলেই ডারউইন ক্ষান্ত থাকেননি, কী করে হয় এবং কেন হয় তাও তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

তাঁর ধারণাগুলো ডারউইন ১৮৪৪ সালে একটি বই-এর আকারে লিখতে শুরু করলেন। আটসাট যুক্তির বাঁধুনি দিতে দিতে পনেরো বছর কেটে গেল। অবশেষে

বন্ধুদের নিতান্ত পীড়াপীড়িতে ১৮৫৯ সালে তিনি বইটি বের করলেন। এই বিখ্যাত বই 'দি অরিজিন অব স্পিসিজ' নামে পরিচিত। তাও তিনি যত কথা প্রথমে লিখেছিলেন তার মাত্র পাঁচ ভাগের এক ভাগ ছাপা হল। ১২৫০ কপি বই একদিনেই বিক্রি শেষ হয়ে গেল। তারপর বারবার ছাপা হতে লাগল এই বই। আজও ছাপা হচ্ছে।

সবাই কি প্রথমেই মেনেছিল তাঁর কথা? মোটেই না। প্রবল বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর বই নিয়ে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের অজস্র যুক্তি আর প্রমাণের কাছে শেষ পর্যন্ত কোনো বিরোধিতাই টেকেনি। ১৮৮২ সালে ডারউইনের মৃত্যু হলে তাঁকে রাজকীয় সম্মানে নিউটনের সঙ্গে ওয়েস্ট মিনস্টারে সমাধি দেওয়া হয়।

bi

ঘর-পাগল কাজ-পাগল সেই ছেলেটি

পনেরো বছরের একটি ছেলে। মেধাবী হলেও বাড়ির অবস্থা তত ভাল নয়। গ্রাম থেকে বন্ধুর সঙ্গে প্যারি এসেছে কলেজে পড়তে। প্যারিতে পড়ার জন্যে তার বন্ধুরা সব পাগল। কিন্তু এখানকার জমকালো আবহাওয়া ছেলেটির একটুও ভাল লাগে না। বাড়ির জন্যে কেবল তার মন কাঁদে।

বাপের তার ট্যানারির ব্যবসা—অর্থাৎ কাঁচা চামড়া পাকা করা তাঁর কাজ। মা এক বাগানের মালীর মেয়ে। বাপ-মায়ের কথা ভেবে ভেবে ছেলেটার শরীর কাহিল হয়ে পড়ে। বন্ধুকে বলে ঃ যদি আমাদের সেই ট্যানারির মিষ্টি গন্ধ একটু পেতাম তা হলে বুঝি শরীরটা চাঙ্গা হয়ে উঠত। শোনো একবার এক পাগলা ছেলের কথা! ট্যানারির বোটকা গন্ধের জন্যে যাকি তার প্রাণ আনচান।

কিন্তু কথাটা মোটেই ঠাট্টা নয়। দেখতে দেখতে অবস্থা এমন হল যে কোনো কিছু খেতে রুচি হয় না, রাতে ঘুম আসে না। শেষকালে তার বাপ এসে ছেলেটাকে প্যারি থেকে নিয়ে গেলেন দেশে, ভর্তি করলেন বাড়ির কাছাকাছি এক কলেজে। সেই থেকে লুই পাস্তুর—এই সে-ছেলেটির নাম—প্রতিজ্ঞা করল, তার মনকে আরও শক্ত করতে হবে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়াশোনায় সে এত ভাল করল যে ছোটখাট একটা চাকরি জুটে গেল কলেজে। বোনের কাছে চিঠিতে লিখল ঃ খুব মন দিয়ে বাড়ির কাজকর্ম করবি কিন্তু। কাজে একবার মন বসলে কাজ না করে থাকা যায় না। আর কাজ ছাড়া তো দুনিয়ার সবকিছুই একেবারে অচল!

সত্যি, কাজ ছাড়া থাকেনি সে জীবনের একটি মুহূর্ত। এর পর ক্রমে ক্রমে মনের দুর্বলতা কাটিয়ে ফেলল পাস্তুর। আবার গেল প্যারিতে পড়তে। সেখানে বিখ্যাত রসায়নবিদ অধ্যাপক দুমা-র বক্তৃতা শুনে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে গেল। কী অপূর্ব বক্তৃতা, কী আশ্চর্য রহস্য রসায়নের! তার মন একেবারে মেতে উঠল রসায়নশাস্ত্র নিয়ে। অবশেষে কঠোর সাধনার স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে করা হল রসায়নবিদ্যার অধ্যাপক।

১৮৫৪ সালে লুই পাস্তুর বদলি হয়ে এলেন লিল শহরের সরকারি কলেজে রসায়নের প্রধান অধ্যাপক হিসেবে। বত্রিশ বছর বয়স তখন তাঁর। আঙুরের রস থেকে দামি দামি মদ তৈরির জন্যে ফ্রান্স বিখ্যাত। অথচ মদের ব্যবসায়ীরা পড়েছেন মহা বিপদে। একটু পুরনো হলেই মদ টকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। উপায় খুঁজতে তাঁরা এলেন পাস্তুরের কাছে।

নানা প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে লাগলেন তিনি। ফলের রস থেকে কেমন করে তৈরি হয় মদ? মদ থেকে সিরকা হয় কী করে? মদ রেখে দিলে টক হয়ে যায় কেন?

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে রেখে তিনি পরীক্ষা করলেন ভাল মদ আর টকে যাওয়া মদ। পরীক্ষা করতে করতে বুঝলেন এক ধরনের জীবাণুই ফলের রস থেকে মদ তৈরির জন্যে দায়ী। চোখে দেখা যায় না এই জীবাণুদের। এমনি আরেক জাতের জীবাণু মদকে টকিয়ে নষ্ট করে দিচ্ছে। তিনি দেখলেন দুধ যে টকে নষ্ট হয়ে যায় তাও এক ধরনের জীবাণুরই কাজ।

পাস্তুর এই জীবাণুদের কাবু করার উপায়ও বাতলালেন। বললেন, মদকে ১২০ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপে খানিকক্ষণ গরম করতে হবে। তা হলেই ক্ষতিকর জীবাণু নষ্ট হবে, মদ রেখে দিলে আর টকবে না। তাঁর এই আবিষ্কার ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ টাকার মদের ব্যবসাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাল। তাঁর এই কায়দায় দুধ যাতে না টকে যায় তার জন্যে জ্বাল দিয়ে নেওয়াকে আজও বলা হয় 'পাস্তুরাইজ' করা।

পাস্তুরই প্রথম প্রমাণ করলেন, কোনো জিনিস পচে যাওয়া বা গেঁজে যাওয়ার মূলে রয়েছে আসলে অতি ছোট ছোট জীবাণু। কোনো তরল জিনিস থেকে যদি সব জীবাণু নষ্ট করে ফেলা যায় আর সেটা রাখা হয় জীবাণুমুক্ত হাওয়ার সংস্পর্শে তা হলে তা আর পচবে না। সেকালের রসায়নবিদরা তাঁর একথা মানতে চাইলেন না। বিশ বছর ধরে তাঁরা তুমুল বিতর্ক চালিয়ে গেলেন তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাস্তুরেরই জিত হল।

এদিকে এর মধ্যে তাঁর দুই ছেলে মারা গিয়েছে টাইফয়েড রোগে। এক মেয়ে মারা গিয়েছে কলেরা হয়ে। নানা ধরনের রোগ কেন হয় তা নিয়ে পাস্তুর গবেষণা শুরু করলেন। তিনি আবিষ্কার করলেন, এসব রোগের গোড়ায় রয়েছে নানারকম অতি ছোট ছোট জীবাণু। তিনি ভাবতে লাগলেন, এই জীবাণুদের কি কোনোরকম করে কাবু করা যায় না!

এই সময় একদিন তাঁর কাছে এলেন পুরনো শিক্ষক দুমা। দুমা বললেন, দক্ষিণ ফ্রান্সে রেশম চাষে মড়ক লেগেছে। এক রহস্যজনক রোগে গুটিপোকা মারা

যাচ্ছে হাজারে হাজারে। প্রত্যেক বছর লক্ষ লক্ষ টাকার রেশম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেসব জায়গার চাষিদের ঘরে ঘরে হাহাকার।

পাস্তুর রেশমের গুটিপোকা আর তুঁত গাছের পাতা নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে দেখলেন এখানেও জীবাণুরই কাজ। তিনি বললেন, এই জীবাণুকে কাবু করতে হলে রোগাক্রান্ত গুটিপোকা আর তুঁত গাছ সব পুড়িয়ে ফেলতে হবে। তারপর আবার ভাল গুটিপোকা আর তুঁত গাছ দিয়ে শুরু করতে হবে চাষ। তাঁর কথামতো কাজ করে ফ্রান্সের কোটি কোটি টাকার রেশম শিল্প রক্ষা পেল।

এরপর আবার কিছু লোক এল পাস্তুরের কাছে ঃ তাদের মুরগিতে মড়ক লেগেছে। কাল যে-মুরগি দিব্যি তাজা হেঁটে বেড়িয়েছে, আজ সকালে হয়তো দেখা গেল তার পাখা নেতিয়ে পড়েছে, পালক সব কাঁটা দিয়ে উঠেছে—তারপর খানিকক্ষণের মধ্যে সে-মুরগি ঢলে পড়ছে মৃত্যুর কোলে। এ হল মুরগির কলেরা, মানুষের কলেরার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। আর ফরাসি দেশে একবার মুরগির কলেরার মড়ক লাগলে শতকরা নব্বইটা মুরগি মারা পড়ত।

পাস্তুর অসুস্থ মুরগির রক্তে আবিষ্কার করলেন এই মারাত্মক রোগের জীবাণু। এমনি একটা অসুস্থ মোরগের ঝুঁটি থেকে কয়েক ফোঁটা রক্ত নিয়ে ফেললেন মুরগির মাংসের ঝোলে। রক্তের জীবাণুরা তাড়াতাড়ি বাড়তে লাগল ঝোলের খাবার পেয়ে। তারপর কয়েক টুকরো রুটিতে মেখে নিলেন সেই ঝোল। এই ঝোল মাখা রুটি যে ক'টা মুরগিকে খাওয়ালেন তার সবগুলো কলেরা হয়ে মারা গেল।

ঝোলটা খোলা পড়ে থাকল ক'দিন। তারপর আবার এই ঝোল-মাখা রুটি দিলেন ক'টা মুরগিকে। ভাবলেন এগুলোও কলেরায় মারা পড়বে। কিন্তু আশ্চর্য! এরা সামান্য একটু অসুস্থ হয়ে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। এদের গায়ে এরপর দেওয়া হল টটকা রোগের জীবাণু। তাতেও তারা মারা পড়ল না। অর্থাৎ পাস্তুর আবিষ্কার

করে ফেলেছেন এক বিস্ময়কর নতুন তত্ত্ব। বাসি জীবাণু মুরগির শরীরে রোগ ঠেকাবার ক্ষমতা জন্মায়! এই নিয়মটা কি অন্য রোগের বা অন্য প্রাণীর বেলাতেও খাটবে?

পাস্তুরের আবিষ্কার অবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করতে চাইল না। তারা বলল, পাস্তুর যদি সত্যি সত্যি রোগ ঠেকাতে পারে তা হলে ঠেকাক দেখি সে অ্যানথ্রাক্স। অ্যানথ্রাক্স এক মারাত্মক রোগ। ফরাসি দেশে গরু-ছাগল-ভেড়ার অর্ধেক মারা যেত এই রোগে। এর মধ্যে অ্যানথ্রাক্সের জীবাণুর কথা জানা গিয়েছে। কিন্তু এই রোগকে ঠেকানো যায় কী করে তা-ই হল পাস্তুরের ভাবনা।

অ্যানথ্রাক্স রোগ ভেড়াদের মধ্যে দেখা দিত প্রবল আকারে। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকার ভেড়া মারা পড়ত এই রোগে। অ্যানথ্রাক্স হলে ভেড়াদের পা হয়ে যেত কমজোর। তারপর বেজায় রকম কাঁপতে কাঁপতে তারা পড়ে যেত মাটিতে। দম আটকে আসত—খানিক পরেই মারা পড়ত সেই ভেড়া। পাস্তুর দেখলেন এই রোগ ছড়ায় এক ভেড়া থেকে আরেক ভেড়ায়। আর এর জীবাণুকেও বাসি আর কমজোর করে রোগের প্রতিষেধক টিকা তৈরি করা যায়। লোকে বলল, টিকা যদি সত্যি বের করে থাক, তা হলে তার প্রকাশ্য পরীক্ষা করে দেখাও। পাস্তুর রাজি হলেন।

১৮৮১ সালের ৫ই মে শুরু হল পরীক্ষা। বহু লোক জড়ো হল পরীক্ষা দেখার জন্যে। পঁচিশটি ভেড়াকে অ্যানথ্রাক্সের টিকা দেওয়া হল। কানে একটা করে ফুটো করে দেওয়া হল তাদের চেনার জন্যে। আর পঁচিশটা ভেড়া রইল টিকা ছাড়া। টিকা দেওয়া ভেড়াগুলো সামান্য অসুস্থ হলেও আবার ভাল হয়ে উঠল। বারো দিন পর তাদের দেওয়া হল আর এক দফা টিকা। এবারও তারা ভাল হয়ে উঠল। তারপর ৩১শে মে তারিখে টিকা দেওয়া আর টিকা ছাড়া সবসুদ্ধ পঞ্চাশটা ভেড়ার গায়েই ফোটানো হল কড়া অ্যানথ্রাক্সের জীবাণু। পাস্তুর ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, তিন দিনের মধ্যে টিকাছাড়া ভেড়াগুলো অ্যানথ্রাক্সে মারা পড়বে।

পাস্তুরের হিসেবমতো ২রা জুন তারিখে বহু লোক এল ভেড়ার এই আশ্চর্য পরীক্ষা দেখতে। এল অনেক বিজ্ঞানী, ডাক্তার, পশু-চিকিৎসক, সাংবাদিক, সাধারণ মানুষ। কী দেখল এসে? বাইশটি ভেড়া মরে পড়ে আছে, আর তিনটি ঝুঁকছে। তার মধ্যে দুটি মারা গেল ঘণ্টাখানেকের মধ্যে, আরেকটি সেদিনই সন্ধেবেলা। আর টিকা-দেওয়া পঁচিশটি ভেড়া বহাল তবিয়তে ঘাস খেয়ে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল।

চারদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। সবার মুখে পাস্তুরের নাম। পাস্তুর কি জাদুকর!—এর পরের বারো বছরের মধ্যে অন্তত তিরিশ লক্ষ ভেড়াকে বাঁচানো হল অ্যানথ্রাক্সের টিকা দিয়ে।

এর পর পাস্তুরের নজর পড়ল হাইড্রোফোবিয়া বা জলাতঙ্ক রোগের দিকে। পাগলা কুকুর কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগ হয়। রোগীর প্রচণ্ড পিপাসা পায়, কিন্তু কিছুতেই পানি খেতে চায় না সে। অতি ভয়ংকর রোগ এটা—ডাক্তারি শাস্ত্রের ইতিহাসে তখন পর্যন্ত জলাতঙ্ক রোগে একটি লোকও বাঁচেনি। পাস্তুর ভাবলেন, অন্যান্য রোগ যদি জীবাণু থেকে হয় তা হলে জলাতঙ্কেরও নিশ্চয়ই জীবাণু আছে। আর এই জীবাণুকে কাবু করতে পারলে জলাতঙ্কের প্রতিষেধক বের করা যাবে।

জীবাণুকে কাবু করতে হলে আগে তো তাকে খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু পাগলা কুকুরের রক্তে কিছুতেই জীবাণু খুঁজে পাওয়া গেল না। পাগলা কুকুরের মুখ থেকে গেঁজা উঠতে থাকে, অনবরত লালা ঝরে। কাচের নল নিয়ে কুকুরের

ফেনানো মুখ থেকে লালা চুষে নিয়ে তিনি পরীক্ষা করতে লাগলেন। শেষটায় তিনি বুঝলেন, জলাতঙ্কের জীবাণু দেখা যাক বা না যাক সেগুলো গিয়ে জমা হয় শিরদাঁড়ায় আর মগজে। পাগলা কুকুরের মগজ বের করে অন্য কুকুরের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে তিনি দেখলেন অল্প ক'দিনের মধ্যেই সেটাও পাগলা হয়ে যায়। এবার শুরু হল অনেক কুকুর আর খরগোশ নিয়ে তাঁর পরীক্ষা।

পাগলা কুকুরের জীবাণু খরগোশের গায়ে ঢুকিয়ে দিয়ে তার মগজ আর শিরদাঁড়া যেখানে মিশেছে তিনি বের করলেন সেখানকার খানিকটা মজ্জা। এই মজ্জা তিনি হাওয়ায় ঝুলিয়ে শুকালেন চোদ্দ দিন ধরে। দেখা গেল এমনি বাস-হওয়া মজ্জা পাগলা কুকুর-কামড়ানো জন্তুর শরীরে ঢোকালে তার আর জলাতঙ্ক হয় না।

কিন্তু কুকুরের জলাতঙ্ক ঠেকাতে পারা এক কথা, আর মানুষের জলাতঙ্ক ঠেকানো আরেক কথা। মানুষের গায়েও কি এই বিষাক্ত জীবাণু ঢুকিয়ে দিলে তার জলাতঙ্ক ঠেকানো যাবে? অনেক ভেবে ভেবে তিনি ঠিক করলেন নিজেই পাগলা কুকুরের কামড় খেয়ে তারপর এই বাসি জীবাণু ঢোকাবেন শরীরে।

ভাগ্যক্রমে পরীক্ষার এক আশ্চর্য সুযোগ জুটে গেল হঠাৎ। ১৮৮৫ সালের ৬ই জুলাই তারিখে তাঁর গবেষণাগারে এল একটি ন'বছরের ছেলে—নাম তার জোসেফ মেইস্টার। মেইস্টারের সারা গায়ে পাগলা কুকুরের বীভৎস কামড়ের দাগ—রক্ত আর কুকুরের লালায় সারা শরীর মাখানো। ডাক্তাররা দেখে বললেন জলাতঙ্ক হয়ে এর মৃত্যু নিশ্চিত। পাস্তুরের টিকায় যদি এখন কিছু হয়। পাস্তুর তার গায়ে ইনজেকশন করে দিলেন চোদ্দ দিনের পুরনো টিকা। পরদিন দেয়া হল তেরো দিনের পুরনো টিকা। এমনি করে দু'সপ্তাহ ধরে চলল চিকিৎসা। আর আশ্চর্য! ছেলেটি ভাল হয়ে গেল—নিশ্চিত জলাতঙ্কের হাত থেকে বেঁচে গেল সে।

আবার চারদিকে ধন্য ধন্য রব পড়ে গেল। বিদ্যুদ্বেগে সারা দুনিয়ায় খবর ছড়িয়ে পড়ল, পাস্তুর জলাতঙ্কের প্রতিষেধক আবিষ্কার করে ফেলেছেন। নানা জায়গা থেকে তাঁর কাছে রোজ এসে হাজির হতে লাগল পাগলা কুকুর কামড়ানো

অসংখ্য লোক। ছ'মাসে যে সাড়ে তিনশো লোক এল তার মধ্যে সবাই ভাল হল—শুধু একটি মেয়ে ছাড়া। তাকে আনা হয়েছিল পাগলা কুকুরে কামড়াবার সাঁইত্রিশ দিন পর; তখন আর চিকিৎসার কোনো উপায় ছিল না। পাস্তুরের চিকিৎসায় এক বছরে প্রায় এক হাজার লোকের জীবন রক্ষা পেল।

এবার পাস্তুরের গবেষণাগারের জন্যে নিজস্ব বাড়ি চাই। দু'হাতে চাঁদা দিতে লাগল সবাই। দেশে দেশে স্কুলের ছেলেমেয়েরা লেগে গেল চাঁদা তুলতে। মিলানের এক খবরের কাগজ চাঁদা তুলল চারশো পাউন্ড। রাশিয়ার জার পাঠালেন সাত হাজার পাউন্ড। সাহায্য পাঠালেন ব্রাজিলের সম্রাট, তুরস্কের সম্রাট। অবশেষে ১৮৮৮ সালে প্যারিতে পাস্তুর ইন্‌স্টিটিউটের উদ্বোধন করলেন ফরাসি দেশের প্রেসিডেন্ট নিজে।

পাস্তুর ডাক্তার ছিলেন না। কিন্তু রোগজীবাণুকে কাবু করবার, রোগ ঠেকাবার যেসব উপায় তিনি আবিষ্কার করেছেন তার সমান আবিষ্কার ডাক্তারি শাস্ত্রে আর কখনো হয়নি। এর পর দেখতে দেখতে তাঁর সহকর্মীরা আবিষ্কার করলেন আরও নানা রোগের প্রতিষেধক— বিউবোনিক প্লেগ, ডিপথেরিয়া, যক্ষ্মা, পোলিও (শিশু-পক্ষাঘাত), টাইফাস ইত্যাদি।

পাস্তুর তাঁর দেশের জন্য এনেছেন অসামান্য সম্মান। মদের শিল্প আর রেশম শিল্পকে বাঁচিয়ে, পশু-পাখির মড়ক দূর করে, নানা রোগের টিকা আবিষ্কার করে দেশের অসাধারণ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। বিজ্ঞানের দানকে সত্যিকারভাবে নিয়োগ করেছেন সাধারণ মানুষের সেবায়।

শুধু তা-ই নয়। পাস্তুর বলেছেন ঃ বিজ্ঞান তো কোনো দেশের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়, তার প্রত্যেকটি বিষয়ে রয়েছে সমগ্র মানবসমাজের অধিকার। —সত্যি কি আজও বিজ্ঞানের বিজয়ে সারা দুনিয়ার মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? তা যেদিন হবে সেদিনই সার্থক হবে পাস্তুরের সারাজীবনের অক্লান্ত সাধনা।

শুধু একটি চাবি

ডানপিটে ছেলে ভল্টু সেদিন ক্লাসের ইলেকট্রিক সুইচ্‌বোর্ডের তার থেকে সিগারেট ধরাতে গিয়ে বেদম এক শক খেল। খোলা দুটো পজিটিভ-নিগেটিভ তার জুড়ে যে-স্পার্ক পাওয়া যায় তা' থেকে সিগারেট ধরানো তার আজই কিছু নতুন নয়। কিন্তু, হঠাৎ শকটা খেয়ে ছলছল চোখে তাকে বলতে হয় ঃ যাই বলিস ভাই, শক জিনিসটা ভারি বিচ্ছিরি!

তার কয়েক দিন পরেই ইলেকট্রিসিটির ক্লাসে প্রফেসর স্পার্কের এক অদ্ভুত কেরামতি দেখালেন। ব্যাপারটা হল এইরকম ঃ একটা রন্ধ কাচের নলের দু'পাশে বিদ্যুতের পজিটিভ-নিগেটিভ তার লাগানো আছ। তার ভেতর দিয়ে বিদ্যুতের প্রবাহ চালিয়ে দিয়ে যদি ধীরে ধীরে নল থেকে পাম্প করে হাওয়া বের করে ফেলা যায়, তাহলে সারাটা নল উজ্জ্বল আলো দিয়ে জ্বলতে থাকে। শেষটায় নলের বাতাস প্রায় সবই বের করে ফেললে ভেতরটা প্রায় অন্ধকার হয়ে আসে, কিন্তু কাচের নলের গা থেকে বেরুতে থাকে একরকম চমৎকার মৃদু আলো।

ক্লাসে এই অদ্ভুত পরীক্ষাটা দেখবার পর থেকে বিদ্যুতের স্পার্ক সম্বন্ধে ভল্টুর ধারণাটা পালটে গেল। সে যখন জানতে পেল, শহরে বড় বড় দোকানে সাইনবোর্ড বা বিজ্ঞাপনের যেসব উজ্জ্বল আলোজ্বলা রঙবেরঙের লেখা, সেগুলো সবই আসলে বৈদ্যুতিক স্পার্কেরই কাণ্ড, তখন এক নতুন জিনিস জানবার আনন্দে তার মনটা খুশিতে ভরে উঠল।

উনিশ শতকের শেষ দিকে ইউরোপের বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিদ্যুতের স্পার্কের এইসব রহস্যময় ব্যাপার নিয়ে বেজায় রকম হইচই চলছিল। জার্মানির উর্জবুর্গ শহরে এমনি সব পরীক্ষা করে যাচ্ছিলেন উইল্‌হেল্‌ম ফন রন্টগেন নামে একজন বিজ্ঞানী।

রন্টগেনের ধারণা ছিল, ফাঁপা কাচের নল থেকে যে-আলো ছিটকে বেরোয় সে হল আসলে একরকমের উজ্জ্বল বিদ্যুতের কণা। নলের নিগেটিভ বা ক্যাথোড প্রান্ত থেকে সেগুলো ছিটকে বেরোয় বলে তাদের নাম দেওয়া হল ক্যাথোড রশ্মি। সত্যি সত্যি সেগুলো বিদ্যুতের কণা কিনা তার হদিস করার জন্যে একদিন তিনি অদ্ভুত রকমের একটা বাঁকানো নল বানালেন। ইচ্ছে, নলের ভেতর দিয়ে বিদ্যুতের কণাগুলো বেঁকে যায় কি না সেটা পরীক্ষা করে দেখা।

অন্ধকার ঘরে ফাঁপা নলের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আগের মতোই হালকা সবুজ আলোয় ঘর ভরে গেল। নলটাকে এবার তিনি একটা কালো কাগজ দিয়ে মুড়ে দিলেন, অমনি আলোটাও ঢাকা পড়ল। এতে করে বোঝা গেল, এই আলোর পুরু কাগজ পেরিয়ে যাবার ক্ষমতা নেই।

রন্টগেন একমনে পরীক্ষা করে যাচ্ছেন তো যাচ্ছেনই। এই আশ্চর্য আলোর রহস্যে তিনি এমন বিভোর হয়ে আছেন যে, নাওয়া-খাওয়ার কথা কিছুই তাঁর মনে নেই। এমনি সময় হঠাৎ তাঁর স্ত্রীর ডাক শোনা গেল ঃ বলি, সারাটা দিন কি উপোস দিয়েই কাটাবে, না খাওয়াদাওয়া আছে!

রন্টগেন কী আর করেন! পরীক্ষার যন্ত্রপাতি টেবিলের ওপর ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি ছুটলেন খেতে।

খেয়েদেয়ে ফিরে এসে দেখেন, আশ্চর্য! নলটা তখনও তেমনি জ্বলছেই। কী ব্যাপার? না, খেতে যাবার সময় বিদ্যুতের সুইচটা নেবাবার কথা তাঁর মনেই ছিল না। যাই হোক, একটা মোটা বইয়ের ওপর নলটাকে ফেলে গিয়েছিলেন; সেখান থেকে সেটাকে তুলে নিয়ে তিনি আবার সেই আশ্চর্য আলোর পরীক্ষায় ডুবে গেলেন।

কিন্তু, এবারেও বাধা পড়ল। আবার তাঁর স্ত্রীর গলা ঃ সকালে ছবি তুলতে তুলতে রেখে দিয়েছিলে, দেখো এ বেলা কী চমৎকার রোদ উঠেছে। ক্যামেরাটা নিয়ে একবার বেরোও দেখি! ওসব পরীক্ষা তোমার পরে হবে।

ছবি তোলা রন্টগেনের বেজায় ঝোঁক। বাইরে রোদটাও উঠেছে সত্যি ভারি চমৎকার। কিন্তু ক্যামেরার প্লেটগুলো গেল কোথায়? সকালবেলা সব ঠিকঠাক করে রেখেছিলেন আর এখনই বেমালুম উধাও। অনেক খুঁজতে খুঁজতে প্লেটের বাক্সটা শেষকালে পাওয়া গেল টেবিলের ওপর একটা বইয়ের তলায়।

ছবি তিনি তুললেন কতগুলো; তারপর সেগুলোকে ডেভেলপ করলেন। চমৎকার এসেছে দৃশ্যগুলো। কিন্তু অবাক কাণ্ড! একখানা ছবির ওপর এই বিরাট চাবির ছায়াটা আবার এল কোত্থেকে?

রন্টগেনের ছাত্ররাও দেখল তাঁর ছবিগুলো। দেখতে দেখতে একটা ছেলে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ঃ এ যে স্যার, আপনার অফিসের তালার চাবির মতন ঠেকছে!

তাই তো! কিন্তু সেই হতচ্ছাড়া চাবিটা এখন কোথায়?

সারা ঘরময় তিনি তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগলেন—চাবি আর কোথাও পাওয়া যায় না। শেষটায় তাঁর স্ত্রী এলেন সাহায্য করতে ঃ তোমার বইপত্রগুলো একটু ঝেড়েঝুড়ে দেখো, কোথাও হয়তো চিহ্ন দিয়ে রেখেছ চাবি দিয়ে। সত্যি সত্যি বড় বইটা ঝাড়তেই তার ভেতর থেকে চাবি বেরুল।

কিন্তু এবারে মহা ভাবনার ব্যাপার হল ঃ মস্ত মোটা বই-এর ভেতর ছিল চাবি। বই-এর তলায় ছিল প্লেটের বাক্স। আর যখন খেতে গিয়েছিলেন তখন অবশ্য নলটা জ্বলছিল—আর সেটা ছিল বই-এর ওপরে। কিন্তু নল থেকে যে-মৃদু আলো বেরোয় সে তো পুরু কাগজ ভেদ করতে পারে না। তা হলে নল থেকে কি আর কোনো অদৃশ্য রশ্মি বেরোতে পারে যা পুরু মোটা বই আর প্লেটের বাক্সের মোড়ক ভেদ করে তার ওপর চাবির ছাপ ফেলেছে? এ যে অদ্ভুত রহস্যজনক ঠেকছে!

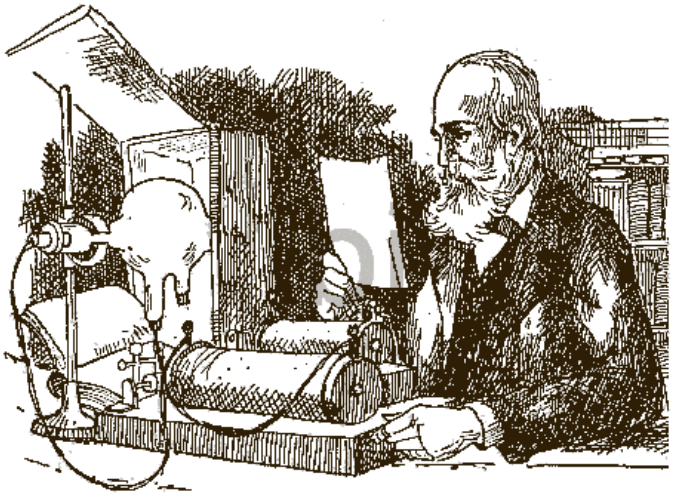

রন্টগেন আবার আগের মতন করে সব কিছু সাজালেন। প্লেটের বাক্সের ওপর বই চাপিয়ে তার মধ্যে চাবি রাখলেন। তার ওপরে বসালেন সেই আলো-দেওয়া নল। তারপর তাঁর খেতে যতটা সময় লেগেছিল ততক্ষণ ধরে ওটাকে অমনি জ্বালিয়ে রাখলেন। প্লেট ডেভেলপ করে দেখা গেল, তার ওপর ঠিক আগের মতোই চাবির ছাপ পড়েছে।

এবারে আর সন্দেহের কোনো কারণ নেই। ওই ক্যাথোড নল থেকে বেরুচ্ছে এক অদৃশ্য রহস্যময় শক্তিশালী রশ্মি। এই রশ্মি সাধারণ আরসব রশ্মির মতো নয়; কেননা এ কাচ, কাগজ বা এ জাতীয় সব জিনিস ভেদ করে যায়; আবার সাধারণ আলোর মতোই ফটোর প্লেটে ছবিও তোলে।

রন্টগেন একদিন এই রশ্মি দিয়ে নিজের হাতের ছবি তুললেন। ছবিতে হাতের চামড়া ফুঁড়ে হাড়গুলো স্পষ্ট ফুটে উঠল। সন্দেহ রইল না যে, এ এক নতুন ধরনের রশ্মি, অদ্ভুত এর গুণপনা। কিন্তু এগুলো যে ঠিক কী, ভেবে ভেবে রন্টগেন তার কোনো হদিস পেলেন না। এগুলো সাধারণ আলো নয়, বিদ্যুৎ নয়, কোনোরকম কণাও নয়—এ একেবারে অজানা আনকোরা নতুন জিনিস। রন্টগেন তাই এদের নাম দিলেন X-ray, অজানা রশ্মি—অঙ্কে যেমন অজানা রাশিকে ধরা হয় 'এক্স' বলে। এই 'এক্স-রে' নামই ওর আজ পর্যন্ত চলে আসছে।

ফুটবল ম্যাচ খেলতে গিয়ে পা-টা হঠাৎ মচকে গিয়েছে ; ডাক্তার আগে তোমার ভাঙা পায়ের একটা এক্স-রে ছবি তুলে নেবেন—ওই ছবি থেকেই বোঝা যাবে, হাড়টাকে কেমন করে জোড়া লাগাতে হবে। সুমনা খেলতে খেলতে সেফটি-পিন গিলে ফেলেছে, এক্স-রে ছবি বলে দেবে সেটা পেটের কোন জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে।

খুসখুস কাশি, কফের সঙ্গে রক্ত—তাড়াতাড়ি বুকটা এক্স-রে করে নাও; দেরি হলে পস্তাতে হবে। মাংস ফুঁড়ে দেখতে পারে বলে এক্স-রে দিয়ে ডাক্তাররা যেন মানুষের শরীরের ভেতর উঁকি দেবার একটা জানালা খুঁজে পেয়েছেন।

খালি মানুষের শরীরেই নয়, কলকারখানার যন্ত্রপাতিতে আজকাল এক্স-রের সাহায্য না হ'লে চলে না। এরোপ্লেনের ইঞ্জিন বানানো হচ্ছে, কিন্তু তার ঢালাইতে যদি সামান্য একটু খুঁতও থাকে তা হলে হয়তো আকাশে উড়তে গিয়ে গোটা এরোপ্লেনটাই এক সময় লোকজনসুদ্ধ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। এক্স-রের ছবি নিয়ে বলে দেওয়া যায়, ভারী যন্ত্রপাতির ভেতরে কোনো খুঁত আছে কি না, থাকলে কোথায় আছে; দামি হীরে মুক্তোর যাচাই করার জন্যে, টাকাকড়ি, ছবির আসল-নকল ধরতে, আরও কত শত কাজে যে আজকাল হর-হামেশা এক্স-রে ব্যবহার করা হচ্ছে তা আর বলে শেষ করা যাবে না।

অথচ ১৮৯৫ সালে রন্টগেনের আবিষ্কারের আগে কিন্তু এই রশ্মির কথা কেউ কখনো কল্পনাও করতে পারেনি।

সুন্দর, হে সুন্দর!

"আমার চোখে বিজ্ঞান হল অনিন্দ্যসুন্দর। গবেষণায় মগ্ন বিজ্ঞানী শুধু যন্ত্রপাতির কারিগর নন, প্রকৃতির রহস্যমালায় বিমুগ্ধ তিনি এক শিশু।"—বলেছিলেন মারি স্ক্লোদভস্কা-কুরি। মাদাম কুরি নামে যাঁর দুনিয়াজোড়া খ্যাতি।

এই সুন্দরের সাধনা করেছিলেন তিনি সারাজীবন ধরে। অভাব-অনটন, ক্ষুধা-দারিদ্র্যের তীব্র জ্বালা বুকে বয়ে কেটেছে তাঁর দিন। তবু পিছিয়ে আসেননি এই অনিন্দ্যসুন্দরের সাধনা থেকে।

কঠোর সাধনায় অবশেষে সাফল্য এসেছে। এসেছে যশ, মান। তাঁর অসাধারণ আবিষ্কারের জন্য দু'-দু'বার নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন—একবার পদার্থবিদ্যায়, আর একবার রসায়নশাস্ত্রে। মেয়ে তো দূরের কথা, আর খুব কম পুরুষই পেয়েছেন এমন দুর্লভ সম্মান।

মারি স্ক্লোদভস্কার জন্ম হয়েছিল পোল্যান্ডের ওয়ারস' শহরে। ১৮৬৭ সালের ৭ই নভেম্বর তারিখে। বাপ-মা দু'জনেই শিক্ষক। বাপ স্কুলে পড়াতেন পদার্থবিদ্যা, মা ছিলেন এক মেয়েদের স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী।

শিক্ষকের সংসার। এমনিতেই তেমন সচ্ছল ছিল না। তার ওপর দেশের তখন বড় দুর্দিন। সে-সময়ে পোল্যান্ড ছিল রাশিয়ার জারের অধীন। দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার কোনো সুযোগ তো ছিলই না, দেশপ্রেমিকদের জারের পুলিশ নানাভাবে নির্যাতন করত।

মারির জন্মের পরপরই মায়ের ধরল যক্ষ্মারোগ। তাঁকে চাকরি ছাড়তে হল। টাকাপয়সার অভাবে ভালরকম চিকিৎসা হল না। ক'বছর পরে এই রোগেই তাঁর মৃত্যু হল। এদিকে দেশপ্রেমিকদের দিকে সমর্থন থাকায় বাবারও চাকরি গেল। শুরু হল অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ।

অভাব-অনটনের মধ্যে মানুষ হলে কী হবে, মারির ছিল তীক্ষ্ণ মেধা। ক্লাসের সেরা ছাত্রী। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় প্রথম হয়ে পাশ করল সে। তার ইচ্ছে, আরও পড়বে, আরও জানবে। কিন্তু পরাধীন দেশে ছেলেদেরই ভাল লেখাপড়ার ব্যবস্থা নেই, মেয়েদের কলেজে পড়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।

নানা দুর্ভোগের মধ্যে মানুষ। দেশের দুঃখে বুক কাঁদে। তাই মারি হয়েছিল তার বয়সের তুলনায় গম্ভীর আর ভাবুক প্রকৃতির। পণ করল সে পদার্থবিদ্যা পড়বে—দেশে নয়, প্যারি গিয়ে। কিন্তু বললেই তো হল না! টাকা কই? ফ্রান্সে যাবার, মেয়ে পড়িয়ে টাকা জমাতে শুরু করল সে। কিছু টাকা জমিয়ে আগে বড় বোনকে প্যারি পাঠাল ডাক্তারি পড়তে, আর নিজে নিজে পড়তে লাগল বিজ্ঞানের নানা বইপত্র।

এমনি করে কাটল বছর ভিনেক। তারপর ১৮৯১ সালে কিছু টাকা জমিয়ে নিজেও পাড়ি দিল প্যারিতে। ভরতি হল বিখ্যাত সোরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সোরবনে এমন সাদামাটা মেয়ে বুঝি খুব কম পড়েছে। কারু সঙ্গে সে মেশে না, হাসি-মস্করায় যোগ দেয় না, শুধু মশগুল হয়ে থাকে তার পড়ার বই আর পরীক্ষাগারে বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি নিয়ে।

থাকে সে এক পুরনো বাড়ির ছ'তলার ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে চিলেকোঠায়। পড়াশোনা নিয়ে এমনই বিভোর যে প্রায়ই তার খাওয়ার কথা মনে থাকে না। ঘর গরম করার জন্যে কয়লা কেনার পয়সা নেই। রাতে ঠাণ্ডায় হিম হয়ে আসে শরীর। হাতপায়ের ঠকঠক কাঁপুনিতে ঘুম আসে না। খিদেয় কাতর শরীর। ক্লাসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে একদিন। তবুও শেষ পরীক্ষায় সবাইকে অবাক করে দিয়ে প্রথম হয় মারি।

সোরবনে পদার্থবিদ্যার তরুণ অধ্যাপক পিয়ের। অল্প বয়সেই নাম করেছেন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করে। তাঁর ভাল লেগে যায় এই সরল অথচ অসাধারণ বুদ্ধিমতী পোলিশ মেয়েটিকে। তিনি প্রস্তাব করেন তাকে জীবনসঙ্গিনী করার। ভেবেচিন্তে মারি সম্মতি দেয়। ১৮৯৫ সালে দু'জনের বিয়ে হয়। মারি হলেন মাদাম কুরি।

এবার শুরু হল দু'জনের একযোগে কাজ। মারি করছেন ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্যে গবেষণা। অধ্যাপক পিয়েরের পরীক্ষাগারে, তাঁরই তত্ত্বাবধানে।

এদিকে জার্মান বিজ্ঞানী রন্টগেনের 'অজানা রশ্মি' নিয়ে চারদিকে তোলপাড় শুরু হয়েছে। ফরাসি বিজ্ঞানী আঁরি বেকরেল পরীক্ষা করতে করতে দেখলেন ইউরেনিয়াম ধাতুযুক্ত কোনো কোনো খনিজ লবণ থেকেও অমনি অদৃশ্য রশ্মি

বেরিয়ে আসে, আর ফটোর প্লেটে দাগ ফেলে। মারি ঠিক করলেন ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্যে ইউরেনিয়ামের এই অদৃশ্য রশ্মি নিয়েই গবেষণা করতে হবে।

মারির গবেষণার জন্যে অনেক চেষ্টাচরিত্র করে একটা জায়গার ব্যবস্থা করা হল। একতলার একটা ভাঙা কাঠের গুদামঘর। তার ছাদ ফুটো, ভেজা স্যাঁতসেঁতে মাটির মেঝে, ঘর গরম করার কোনো ব্যবস্থা নেই। তবু এখানেই মারি শুরু করলেন তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণা।

গবেষণার যন্ত্র বানিয়েছিলেন পিয়ের। জানা গিয়েছিল 'অদৃশ্য রশ্মি'র একটা গুণ এই যে, এর সাহায্যে বাতাসে একধরনের বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হয়। দুটো ধাতুর পাত্রের মাঝখানে যদি একটুখানি ইউরেনিয়াম রাখা যায় তা হলে অদৃশ্য রশ্মির প্রভাবে হাওয়ার ভেতর দিয়ে এক পাত থেকে আরেক পাতে বিদ্যুৎ চলাচল করে। পিয়ের এই বিদ্যুতের পরিমাণ মাপার একটা ব্যবস্থা আবিষ্কার করেছিলেন। বিদ্যুতের পরিমাণ যত বেশি হবে, বুঝতে হবে অদৃশ্য রশ্মির তেজও তত বেশি।

এক এক করে চেনা-জানা নানা জিনিস নিয়ে মারি পরীক্ষা করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন কোনো লবণের মধ্যে এই রশ্মির তেজ নির্ভর করে তাতে কতটা ইউরেনিয়ামের পরমাণু আছে তার ওপর। অর্থাৎ ইউরেনিয়ামের পরমাণুই আসলে এই রশ্মির জন্যে দায়ী, লবণের মধ্যেকার অন্য কোনো উপাদান নয়। ইউরেনিয়াম ছাড়া আরও একটি ভারী ধাতুতে তিনি এই অদৃশ্য রশ্মি আবিষ্কার করলেন, তার নাম থোরিয়াম। দেখা গেল এসব রশ্মিতে রয়েছে প্রচণ্ড তেজ। তাই কোনো ধাতু থেকে এ রকম অদৃশ্য রশ্মি বের হওয়ার তিনি নাম দিলেন 'তেজস্ক্রিয়া'।

এই সময়ে ইউরেনিয়াম ধাতুটা সংগ্রহ করা হত খনি থেকে তোলা পিচ্‌ব্লেন্ড নামে আকরিক থেকে। ১৮৯৮ সালে একদিন মারি একখণ্ড পিচ্‌ব্লেন্ড নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেন তার তেজস্ক্রিয়া ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম থেকে যতটা অদৃশ্য রশ্মি বেরোতে পারে তার চাইতে অনেক বেশি। বারবার তিনি একই পরীক্ষা করলেন। তবু আশ্চর্য! বারবার একই রকম ফল পাওয়া গেল। তাহলে কি ওতে ইউরেনিয়াম বা থোরিয়ামের চেয়েও বেশি তেজস্ক্রিয় কোনো অজানা মৌলিক পদার্থ রয়েছে?

ব্যাপারটা গুরুতর। সম্ভবত মারি দাঁড়িয়ে আছেন নতুন কোনো আশ্চর্য আবিষ্কারের মুখোমুখি। পিয়ের বুঝলেন তাঁর স্ত্রীর এই অসাধারণ গবেষণার সম্ভাবনা। তাই তাঁর নিজের গবেষণা ছেড়ে দিয়ে যোগ দিলেন মারির গবেষণার সহযোগী হিসেবে।

দু'জনে মিলে শুরু হল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পিচ্‌ব্লেন্ডের বিভিন্ন উপাদান পৃথক করা। ক্রমাগত পৃথক করতে করতে ১৮৯৮ সালের জুলাই মাসে দু'জনে এক চিমটে কালো গুঁড়ো পৃথক করলেন, তার তেজস্ক্রিয়া ইউরেনিয়ামের চেয়ে চারশো গুণ বেশি। দেখা গেল এটি এক নতুন মৌলিক পদার্থ যার কথা বিজ্ঞানীদের আগে জানা ছিল না। মারি তাঁর জন্মভূমি পোল্যান্ডের নামে এর নাম রাখলেন 'পোলোনিয়াম'।

কিন্তু মনে হল তবু পিচ্‌ব্লেন্ডে আরও তেজস্ক্রিয়া রয়ে গিয়েছে। আবার আরও পরীক্ষা, আরও সূক্ষ্মভাবে পৃথক করা। সেই বছরই ডিসেম্বর মাসে তাঁরা খুব সামান্য মাত্রায় আর একটা নতুন জিনিস পৃথক করলেন। এটা পোলোনিয়ামের চেয়ে আরও

বেশি শক্তিশালী। এই নতুন মৌলিক পদার্থের তাঁরা নাম দিলেন 'রেডিয়াম'।

কিন্তু তাঁদের কথা সবাই বিশ্বাস করল না। এত সামান্য রেডিয়াম তাঁরা যোগাড় করেছিলেন যে তা চোখে দেখা যায় না, ওজন করা যায় না। ধরা-ছোঁয়া যায় এরকম রেডিয়াম সংগ্রহ করতে হলে প্রচুর পিচ্‌ব্লেন্ড দরকার। অত পিচ্‌ব্লেন্ড কেনার তো তাঁদের সামর্থ্য নেই!

আজকে যে-দেশটাকে চেকোস্লোভাকিয়া বলা হয় সে-জায়গায় বোহেমিয়া বলে এক অঞ্চলে তখন প্রচুর পিচ্‌ব্লেন্ড পাওয়া যেত। কারখানার মালিকেরা আকরিক থেকে রুপো পৃথক করে বাকি পিচ্‌ব্লেন্ডটা ফেলে দিত। তারা এই পাগলা বিজ্ঞানীদের প্রস্তাব শুনে বললঃ আবর্জনাগুলো স্বচ্ছন্দে দিয়ে দেব যদি কেউ গাড়ি ভাড়া দিয়ে ওগুলো নিয়ে যায়।

তাঁদের টানাটানির সংসারে বহু কষ্টে জমানো টাকা খরচ করে তাঁরা এই পিচ্‌ব্লেন্ড আকরিক নিয়ে এলেন। তারপর সেই স্যাঁতসেঁতে ঘরে দিনের পর দিন ধরে চলল তাকে শোধন করা। বিরাট বিরাট কড়াইতে অ্যাসিডে জ্বাল করা হচ্ছে আকরিক। মারি লম্বা কাঠি দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে নেড়ে যাচ্ছেন। সংগ্রহ হচ্ছে খানিকটা তেজস্ক্রিয় উপাদান। আবার তাকে নিখাদ করা হচ্ছে আরও জ্বাল করে।

এদিকে ১৮৯৭ সালে মারির কোলে এসেছে ফুটফুটে একটি মেয়ে। নাম তার আইরিন। এই মেয়ের দেখাশোনা করতে হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে চলছে দিনরাত অমানুষিক পরিশ্রম। একদিন দু'দিন নয়। চার বছর ধরে চলল এই পিচ্‌ব্লেন্ড শোধন করা। ক্রমে ক্রমে আরও তেজি, আরও জোরালো তেজস্ক্রিয় উপাদান পৃথক করা।

চার বছরের একনাগাড়ে পরিশ্রমের পর প্রায় তিরিশ মন পিচ্‌ব্লেন্ড থেকে পাওয়া গেল এক রতিরও কম একরকম বিশুদ্ধ সাদা গুঁড়ো। এই সেই দুর্লভ বস্তু—রেডিয়াম। এর জোরালো বিকিরণে যে-কাচের পাত্রে একে রাখা হয়েছিল সেটা অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে জ্বলতে লাগল। এবার আর কারও অবিশ্বাস করার যো রইল না।

১৯০৩ সালে মারি তাঁর আবিষ্কারের বিবরণ দিয়ে ডক্টরেট-এর থিসিস দাখিল করলেন। এমন দামি থিসিস বুঝি আর কখনো লেখা হয়নি। সেই বছরই তিনি ইউরেনিয়ামের বিকিরণ সম্পর্কে গবেষণার জন্যে পদার্থবিদ্যায় নোবেল প্রাইজ পেলেন—বেকরেল আর পিয়েরের সঙ্গে একযোগে। ১৯১১ সালে পেলেন রসায়নশাস্ত্রে নোবেল প্রাইজ—পোলোনিয়াম আর রেডিয়াম আবিষ্কারের জন্যে।

দ্বিতীয় নোবেল পুরস্কার পিয়ের দেখে যেতে পারেননি। ১৯০৬ সালে অন্যমনস্কভাবে পথ চলতে গিয়ে এক ঘোড়ার গাড়ির তলায় তাঁর মাথা গুঁড়িয়ে যায়—তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

পিয়েরের মৃত্যুর পর ফ্রান্সে আর এমন কোনো পুরুষ-বিজ্ঞানী পাওয়া গেল না যাঁকে সোরবনে পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক করা যায়। তাই মেয়ে হলেও মারিকেই দিতে হল এই আসন। এর আগে সোরবনের ইতিহাসে আর কখনো কোনো মহিলাকে এত বড় সম্মান দেওয়া হয়নি।

এদিকে রেডিয়ামের আবিষ্কার নিয়ে সারা দুনিয়ায় শুরু হল তোলপাড়। বিজ্ঞানীদের বহুকালের বহু ধারণা সম্পূর্ণ পালটে ফেলতে হল। এতদিন ধারণা করা হত বস্তুর পরমাণুই হল সবচাইতে ছোট কণিকা, আর এর কোনো পরিবর্তন হয় না। কিন্তু দেখা গেল রেডিয়াম থেকে যেসব রশ্মি বেরোয় তাতে রয়েছে আরও ছোট ছোট কণিকা। এসব কণিকা বিকিরণ করে রেডিয়ামের পরমাণু ক্রমে ক্রমে পরিণত হয় অন্য হালকা মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে। আর এই যে প্রচণ্ড তেজ বেরিয়ে আসে রেডিয়ামের বিকিরণে, তার মধ্যেই পাওয়া গেল পারমাণবিক শক্তির সূত্র।

বিজ্ঞানীরা দেখলেন রেডিয়ামের বিকিরণ ইউরেনিয়ামের চেয়ে বহু লক্ষ গুণ শক্তিশালী। রেডিয়ামের রশ্মি দুরারোগ্য ক্যানসার রোগের চিকিৎসায় কাজ দিল। দুনিয়ার নানা দেশের হাসপাতালে দেখা দিল রেডিয়ামের চাহিদা।

কুরি-রা যে-নিয়মে রেডিয়াম পৃথক করেছিলেন তা পেটেন্ট করলে বহু টাকা করতে পারতেন তাঁরা। কিন্তু মারি আর পিয়ের সে-চেষ্টা করেননি। সাধারণ মানুষের সেবায় তাঁরা তাদের আবিষ্কারকে উৎসর্গ করেছেন।

সারাজীবন গবেষণা করেছেন রেডিয়াম নিয়ে। রেডিয়ামের প্রচণ্ড শক্তিশালী বিকিরণ কী করে ক্যানসারের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে পারে তার জন্যে করেছেন অক্লান্ত সাধনা। কিন্তু সেই রেডিয়ামের তেজি রশ্মি এদিকে তিলে তিলে তাঁর হাড়-মাংস-রক্তে ঘুণ ধরিয়েছে, দেখা দিয়েছে দুরারোগ্য ব্যাধি।

উজ্জ্বল রেডিয়ামের দীপ্তি। চোখ-জুড়ানো যার সৌন্দর্য। যে-সুন্দরের সাধনা করেছেন মারি সারাটা জীবন। সেই সুন্দরের সাধনায় তাঁর মৃত্যু ঘটল ১৯৩৪ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে।

ভারি এক মজার লোক

বেলজিয়ামের রানির সেবার এক মেহমান এসেছিল। এমন আজব মেহমান তার আগে বুঝি কেউ কখনো দেখেনি; এমন মজার লোকের কথাও শোনা যায়নি কখনো।

রানির মেহমান। তাও এক বিখ্যাত লোক—দুনিয়ায় এমন নামজাদা লোক নাকি আর জন্মায়নি কখনো। কাজেই সে-মেহমানের যোগ্য সংবর্ধনার জন্যে দেশসুদ্ধ হইচই। রানির উজির-নাজির-সভাসদ সবাই তটস্থ। রাজপ্রাসাদের চারদিক ফিটফাট ছিমছাম। দুনিয়ার সেরা মানুষটির পায়ের ধুলোয় আজ ধন্য হবে রানির প্রাসাদ।

ব্রাসেল্‌স্ ইস্টিশনে সেদিন ট্রেনের অপেক্ষায় হাজির দরবারের বাছাই-করা উজির-নাজির সবাই। ট্রেন থেকে রাজসমারোহে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে প্রাসাদে।

অবশেষে ট্রেন এসে থামল। এ-কামরায় সে-কামরায় খোঁজাখুঁজি—কিন্তু সে-লোকের কোনো হদিস নেই। যে-মেহমানের জন্যে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছেন বেলজিয়ামের রানি তিনি কি আসেননি তা হলে?

মস্ত বড় লোক। সবাই জানে বড় খেয়ালি তিনি। বলেছিলেন আসবেন, কিন্তু শেষটায় হয়তো মত পালটে ফেলেছেন। ওই যে ওদিকে আধপাগলা গোছের এক বুড়ো হাতে সুটকেস আর এক বেহালা বগলদাবা করে নেমে মনের ফুর্তিতে হাঁটতে হাঁটতে চলেছে। এমনি কত যাত্রীই তো উঠছে-নামছে। কিন্তু দুনিয়াজোড়া যাঁর নাম সেই মহামান্য অতিথিকে তো কোথাও দেখা যাচ্ছে না!

খবরটা শুনে রানির মেজাজ গেল খারাপ হয়ে। আর হবে না-ই-বা কেন? এত আয়োজন, এত তোড়জোড়ের পর যদি মেহমান না আসেন তা হলে কারই-বা মেজাজ ঠিক থাকবে!

এমন সময় প্রাসাদের দরজায় ঘণ্টা বেজে উঠল। আরে, এ যে ইস্টিশনের সেই আধপাগলা বুড়োটা! এক হাতে সুটকেস, অন্য হাতে বেহালা—বুড়ো বলে কিনা রানির সঙ্গে একটু দেখা করবে! চাপরাশি পেয়াদার দল সব হাঁহা করে উঠল। রানির এখন মেজাজ-মর্জির কিছু ঠিক নেই। এই কি তাঁর এক ভবঘুরে লোকের সঙ্গে দেখা করবার সময়?

এমন সময় রানি নিজেই ছুটে এলেন। একি! আপনি!! এভাবে!!!—দারোয়ান-চাপরাশি উজির-নাজিরদের মুখ থেকে আর কথা সরে না। এই আধপাগলা বুড়োই সেই! কে বলবে ইনিই এত বড় মানী মেহমান!

তাঁকে আনার জন্যে ইস্টিশনে লোক গিয়েছিল, গাড়ি গিয়েছিল—শুনে লোকটাও কম অবাক হয় না। তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্যে এসবের তো কোনো দরকার ছিল না! গাড়িতে এলে কি হেঁটে আসার মতো আনন্দ পাওয়া যেত?

এই সেই মজার লোক, যার কথা বলছি। হালকা রুপেলি চুল মাথার ওপর উড়ছে, গায়ে এলোমেলো পোশাক। একটা চমৎকার বেহালা তার সবসময় সঙ্গী। ভারি মিষ্টি বেহালা বাজায় লোকটা, যে শোনে সে-ই তন্ময় হয়ে যায়। কিন্তু লোকজন দেখে তার বেজায় ভয়। লোকজনকে কেবল এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। দেশসুদ্ধ লোক তবু তার পিছু পিছু ছোটে, তার কথা শোনার জন্যে পাগল হয়।

না, বেহালা শোনার জন্যে কিন্তু পিছু ছোটে না। শুনলে অবাক হবে—তাঁর নামডাক হল আঁক কষার জন্যে। আর তিনি যেসব আঁক কষেন, যেসব কথা লেখেন তা নাকি পুরোপুরি বোঝে দুনিয়ার খুব কম লোকেই। দুনিয়ার সেরা সেরা পণ্ডিতদেরও অনেক সময় তাঁর কথা বুঝতে মাথা ঘুলিয়ে যায়।

কিন্তু এমন যে ধুরন্ধর আঁক কষিয়ে, অনেক সময় ছোটখাটো হিসেব তিনি মেলাতে পারেন না। সংসারের হিসেব সব গিন্নির ওপর তুলে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত। সংসারের হিসেবের খোঁজ দূরের কথা, অনেক সময় নিজের খোঁজই তিনি রাখেন না।

একবার প্যারির রাস্তায় তিনি হারিয়ে গিয়েছেন। হোটেল আর কিছুতে খুঁজে পান না। হোটেলের নাম জানেন তাঁর গিন্নি, কিন্তু তিনি তো হোটেলেই রয়েছেন! এক রেস্তরাঁয় বসে লোকটি ভেবে ভেবে সারা হচ্ছেন কী করে তাঁর হোটেল খুঁজে বের করবেন। শেষটায় পুলিশের সাহায্যে যখন তাঁকে পাওয়া গেল তখন দেখা গেল তাঁর হোটেলটি রাস্তার ঠিক ওপারেই। এতক্ষণ তিনি বসে বসে হোটেলের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন, তবু চিনতে পারেননি। এমনি আপনভোলা লোক তিনি।

এই সেই মজার লোক। নাম তাঁর আলবার্ট আইনস্টাইন। দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা বিজ্ঞানী; সারা দুনিয়ার সব গভীর রহস্য তাঁর নখের ডগায়। অথচ কী শিশুর মতো সরল, কী নিরীহ, নির্বিকার!

আইনস্টাইন যে এত বড় পণ্ডিত হবেন তা কিন্তু তাঁর ছোটবেলায় কেউ ভাবতে পারেনি। ১৮৭৯ সালের ১৪ই মার্চ জার্মানির উলম্ শহরে তাঁর জন্ম হয়। ছোটবেলায় কথা ফুটতে বড্ড দেরি হয়েছিল। বাপ-মা তো ভারি চিন্তায় পড়েছিলেন শেষটায় ছেলে না একেবারে হাবাগোবা হয়! বড় হয়েও তিনি কথা খুব কমই বলতেন।

স্কুলে যখন পড়তে গেলেন তখন শিক্ষকেরাও তাঁর মধ্যে তেমন কিছু প্রতিভার পরিচয় পেলেন না। ক্লাসে কোনোরকম করে উতরে যেতেন। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন সব বেয়াড়া প্রশ্ন করে বসতেন যে শিক্ষকরা তার জবাব দিতে পারতেন না। তাই তাঁকে পছন্দ তো করতেনই না, বরং বুঝি-বা ভয়ই পেতেন।

ষোলো বছর বয়সে আইনস্টাইন জিজ্ঞেস করলেন ঃ আচ্ছা, চলন্ত ট্রেনের সঙ্গে যদি কেউ ছোটে তা হলে তার কাছে তো ট্রেনটা স্থির মনে হবে। তেমনি আলো যে ঢেউ-এর আকারে চলে সেই ঢেউ-এর সঙ্গে সঙ্গে যদি কেউ ছুটতে পারে তা হলে তার কাছে আলোর ঢেউও কি স্থির বলে মনে হবে?—শোনো একবার কথাটা! এমন উদ্ভট চিন্তা নিতান্ত গবেট ছাড়া কেউ কি করে?—অথচ বছর দশেক পরে এই সামান্য প্রশ্ন থেকেই জন্ম হল তাঁর দুনিয়া-কাঁপানো আপেক্ষিক তত্ত্বের।

স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি ভরতি হতে চাইলেন জুরিখে সরকারি পলিটেকনিক স্কুলে। কিন্তু ভরতি পরীক্ষাতেই করলেন ফেল। তাই ভরতি হতে হল পরের বছর। ক্লাসের পড়া যা-ই থাক তিনি অঙ্ক আর পদার্থবিদ্যার নানা বিষয়ে নিজের মনে পড়াশোনা করে যেতে লাগলেন। তাঁর মনে যেসব প্রশ্ন দেখা দিত সেগুলো তো আর ক্লাসে পড়ানো হত না! আর শিক্ষকদের জিজ্ঞেস করেও এসব ঝামেলাছাড়া প্রশ্নের কোনো জবাব পাওয়া যেত না।

ইচ্ছে ছিল শিক্ষকতা করবেন। তাই ১৯০০ সালে পলিটেকনিক থেকে পাশ করে বেরিয়ে শিক্ষকতার চাকরির জন্যে দরখাস্তও করেছিলেন। কিন্তু কপাল মন্দ, তাঁকে যোগ্য বলে বিবেচনা করা হল না। কী আর করা! বার্ন শহরে পেটেন্ট অফিসে এক ছোটখাটো চাকরি যোগাড় করলেন। এখানে জুটল কাজের ফাঁকে যথেষ্ট অবসর। গণিত আর পদার্থবিদ্যা নিয়ে চিন্তা আর গবেষণা করবার প্রচুর সুযোগ। তাই হয়ে দাঁড়ালেন তিনি দুনিয়ার সব বিজ্ঞানীর সেরা বিজ্ঞানী; সব ওস্তাদের বড় ওস্তাদ।

আপেক্ষিক তত্ত্বের মূল কথা ঘোষণা করলেন তিনি ১৯০৫ সালে। তিনি বললেন, বস্তু আর শক্তিকে আমরা সচরাচর আলাদা বলে জানি; কিন্তু আসলে গোড়ায় এরা একই। কতখানি বস্তু কতখানি শক্তির সমান তাও তিনি হিসেব করে বলে দিলেন। এমন কথা এর আগে আর কোনো পণ্ডিত বলেননি। বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের গোটা ধারণা রাতারাতি অনেকখানি পালটে গেল।

এত বড় কথা আইনস্টাইন কিন্তু বলেছিলেন অতি সাদামাটা দু'টি ধারণা থেকে। তার একটা হল আপেক্ষিকতার নীতি। অর্থাৎ আমরা স্থির রয়েছি না ক্রমাগত আলতোভাবে চলছি তা নিশ্চয় করে বলা শক্ত। পৃথিবীর তুলনায় হয়তো একটা জিনিস স্থির; কিন্তু সূর্যের তুলনায় তার একধরনের গতি রয়েছে; আবার

শুক্রগ্রহের তুলনায় তার গতি অন্য ধরনের। তাঁর আর একটা ধারণা হল আলোর উৎসের বেগ যা-ই হোক, তার ওপর আলোর বেগ নির্ভর করে না। নৌকোয় বসে যদি কাঠি দিয়ে নেড়ে পানিতে ঢেউ তোলা যায় তাহলে সে-ঢেউ ছুটে চলে চতুর্দিকে; নৌকোটা স্থির থাকুক বা চালু থাকুক তাতে ঢেউ-এর গতির কিছু এসে যায় না।

কথাগুলো ভারি সাধারণ শুনতে। কিন্তু এমনি সব সাধারণ ভাবনা নিয়েই ছিল আইনস্টাইনের কারবার। আর এমনি সব সাধারণ ভাবনা থেকেই তিনি আবিষ্কার করেছেন বিশ্বপ্রকৃতির নানা অসাধারণ সত্য।

কেমন সাদাসিধে তাঁর চিন্তার ধারা সে-সম্বন্ধে একটি গল্প শোনো। একদিন তিনি পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন; হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামল। আইনস্টাইন তাড়াতাড়ি মাথার হ্যাটটা খুলে নিয়ে ওভারকোটের তলায় বগলদাবা করে রাখলেন। বন্ধুরা জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাটটা লুকোচ্ছেন কেন? আইনস্টাইন মুচকি হেসে বললেন, দেখুন বৃষ্টির পানিতে ভিজলে হ্যাটটা খারাপ হয়ে যাবে; কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে মাথার চুলের তো কোনো ক্ষতি হবে না! —কী সরল যুক্তি।

এমনি সরল যুক্তি তিনি প্রয়োগ করেছেন প্রকৃতির নানা জটিল আর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে। ১৯১৫ সালে তিনি বললেন, বস্তু আর শক্তি যখন একই জিনিসের দুই ভিন্ন রূপ তখন বস্তু আর শক্তির কোনো কোনো গুণ নিশ্চয়ই হবে একরকম। বিরাট আকারের বস্তু ছোট আকারের বস্তুকে আকর্ষণ করে কাছে টেনে নিতে পারে।

আলোর রশ্মি একধরনের শক্তি। বিরাট আকারের বস্তু তা হলে আলোর রশ্মিকেও কাছে টানতে পারে। অর্থাৎ আলোর রশ্মি যদি বিরাট কোনো বস্তুর কাছে দিয়ে যায় তা হলে এই টানের জন্যে তার পথ কিছুটা বেঁকে যাবে।

চার বছর পরে বিজ্ঞানীরা আইনস্টাইনের কথাটা পরীক্ষা করে দেখার মওকা পেলেন। ১৯১৯ সালের ২৯শে মার্চ তারিখে এক সূর্যগ্রহণ হল। সূর্যগ্রহণের সময় সূর্য অন্ধকারে ঢেকে যায়—তাই সূর্যের আশেপাশের আকাশে যেসব তারা থাকে সেগুলো তখন ফুটে ওঠে। আইনস্টাইনের কথা যদি ঠিক হয় তা হলে সূর্যের কাছ দিয়ে আসবার সময় তারাদের আলোর পথ যাবে বেঁকে। পৃথিবী থেকে মনে হবে তারাদের জায়গাই গিয়েছে বদলে।

সূর্যগ্রহণের সময় তারাদের ছবি তোলার জন্যে বিজ্ঞানীরা একদল গেলেন ব্রাজিলের উত্তরে, আরেক দল ছুটলেন আফ্রিকার পশ্চিমে এক দ্বীপে। ঠিক সূর্যগ্রহণের সময় বিরাট বিরাট জটিল ক্যামেরায় ছবি নেওয়া হল সূর্যের আশেপাশে তারাদের। তারপর এই ছবির সঙ্গে মেলানো হল রাতে তোলা সেইসব তারাদের ছবি।

জিজ্ঞানীরা এসব ছবি নিয়ে অনেক মাপজোক করলেন। তারপর আশ্চর্য! সবাইকে অবাক করে দিয়ে তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, আইনস্টাইনের কথাই ঠিক। তারাদের আলোর পথ বেঁকে গিয়েছে সূর্যের কিনার দিয়ে যাবার সময়। সূর্যের আকর্ষণের টান কাজ করছে শুধু তার গ্রহ-উপগ্রহের ওপর নয়, আলোর রশ্মির ওপরও। নিউটনের সময় থেকে বিজ্ঞানীরা যেসব কথা জেনে এসেছেন তা এবার পালটাতে হল। সবাই স্বীকার করে নিলেন, নিউটনের পরে আইনস্টাইনের মতো এত বড় আবিষ্কার আর কেউ করেননি।

১৯২১ সালে আইনস্টাইন নোবেল প্রাইজ পেলেন পদার্থবিদ্যায়। ১৯০৫ সালে তিনি তাঁর সবচাইতে বড় তত্ত্ব ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু স্বীকৃতি পেতে তাঁর এতদিন লাগল কেন? তার কারণ সবাই প্রথমে তাঁর কথা বিশ্বাস করতে চায়নি। আগেকার যে প্রচলিত ধারণা এই দুনিয়ার রূপ সম্বন্ধে তা সহজে লোকে বদলাতে চায়নি।

কিন্তু আইনস্টাইনের সম্মানে সবাই কি খুশি হয়েছিল? না তাও হয়নি। শুনলে আশ্চর্য হবে, তাঁর দেশের সরকার এত বড় পণ্ডিতের মাথার জন্যে হাজার পাউন্ড পুরস্কার ঘোষণা করেছিল।

জার্মানির সরকার তাঁর মাথার জন্যে মাত্র হাজার পাউন্ড দাম ধরল কেন?—১৯৩৩ সালে নাৎসীরা ক্ষমতায় আসার পর শুরু করল যুদ্ধের আয়োজন। আশেপাশের দেশগুলো জোর-জবরদস্তি করে দখল করবে এই তাদের মতলব। আইনস্টাইন তাতে সায় দেননি। বরং দাঁড়িয়েছিলেন তার বিরুদ্ধে—অন্যায় আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে। তাই হিটলার চেয়েছিল তাঁকে দুনিয়ার ওপর থেকে সরিয়ে ফেলতে।

কিন্তু হিটলারের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। আইনস্টাইন জার্মানি থেকে পালিয়ে আমেরিকায় গিয়ে আরও বাইশ বছর বেঁচেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, ১৯৩৯ সালে যখন বোঝা গেল পরমাণুর শক্তিকে কাজে লাগানো সম্ভব আর জার্মানি এ নিয়ে কাজ

করছে, তখন আইনস্টাইন বিজ্ঞানীদের পক্ষ হয়ে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে এক চিঠি লেখেন। এই চিঠির ফলে মার্কিন সরকার পারমাণবিক বোমা তৈরির জন্যে টাকা বরাদ্দ করলেন। পৃথিবীতে নতুন এক পরমাণু যুগের জন্ম হল।

সত্যি সত্যি যখন পারমাণবিক বোমার ঘায়ে জাপানের কয়েক লক্ষ মানুষ মারা পড়ল তখন আইনস্টাইন মনে বড় ব্যথা পেয়েছিলেন। আবার বিজ্ঞানীদের পক্ষ হয়ে তিনি চিঠি লিখলেন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে। প্রতিবাদ জানালেন পরমাণু শক্তির ধ্বংসকর ব্যবহারের বিরুদ্ধে, দাবি করলেন শুধু শান্তির জন্যে পরমাণু শক্তিকে ব্যবহার করা হোক।

এই অসাধারণ প্রতিভাশালী, মানবদরদি বিজ্ঞানী ১৯৫৫ সালের ১৮ই এপ্রিল প্রাণত্যাগ করেন।

প্রকৃতিকে বাগ-মানানো

মানুষ বড় হয়েছে বুদ্ধির জোরে—আশেপাশের চারদিকে দুনিয়াটাকে জয় করে। জানোয়াররা নিজের জীবনধারণের জন্যে নির্ভর করে প্রকৃতির দানের ওপর। আর সেখানে প্রকৃতির কাছ থেকে নিজের আহার মানুষ বুদ্ধির জোরে আদায় করে নিয়েছে, হাত পেতে চেয়ে নেয়নি। প্রকৃতিকে সে বাধ্য করেছে তার দরকারি সব রকমের শক্তি, আশ্রয় ও আরামের ব্যবস্থা যোগাতে।

কী করে এটা সম্ভব হল?—এ-প্রশ্ন সহজেই মনে জাগে। তার সহজ উত্তর হচ্ছে ঃ মানুষের হাতে আছে এক অমোঘ হাতিয়ার—সে-হাতিয়ার হল বিজ্ঞান।

আমাদের দেশ থেকে অনেক উত্তরে সাইবেরিয়া নামে একটা জায়গা আছে। বছরের বেশির ভাগ সময় বরফে ঢাকা থাকে—এমনই ঠাণ্ডা জায়গা সেটা।

সাইবেরিয়ার এক চাষির ছেলে ইয়েফ্রেমভ। তার হাতে কেমন করে জানি তারই দেশের এক বিজ্ঞানীর লেখা কয়েকখানা বই গিয়ে পড়ে। বিজ্ঞানী তাতে বলেছিলেন ঃ প্রকৃতি থেকে মাটি আর পানি, আলো আর বাতাস নিয়ে গাছেরা মানুষের জন্যে খাদ্য তৈরি করে। কিন্তু প্রকৃতিকে জয় করতে পারলে আমরাই ইচ্ছামতো খাদ্যে ফলাতে পারি। আমাদের কাজই হচ্ছে প্রকৃতিকে বশ মানানো।

পড়তে পড়তে এক আশ্চর্য চিন্তা তরুণ ইয়েফ্রেমভকে পেয়ে বসে। অনেক ভেবে ভেবে এক নতুন জিনিস তার মাথায় এল। মাঠে মাঠে লোকের কাছে গিয়ে সে বলে বেড়াতে লাগল ঃ আচ্ছা, তোমরা যে খেতে পানি আর সার দিচ্ছ, কিন্তু শস্যের জন্যে এর চাইতেও তো দরকারি জিনিস আছে।

চাষিরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ সে আবার কী! সার আর পানিই তো গাছের জন্যে যথেষ্ট।

হুঁ, কিন্তু সূর্যতাপও দরকার! পানি আর মাটি থেকে শস্য তৈরি করতে যে-শক্তি লাগে, সূর্যই তো তার যোগান দেয়।

বোকা ছেলেটার কথা শুনে সকলে হোহো করে হেসে উঠল ঃ তা, তুমি যদি একটা নতুন কল বানিয়ে সূর্যের তেজ একটুখানি বাড়িয়ে দিতে পার—।

ইয়েফ্রেমভের চোখ দুটো একটা অপূর্ব উত্তেজনায় অদ্ভুতভাবে জ্বলজ্বল করতে লাগল। শস্য বাড়াবার খুব সোজা একটা উপায় বের করেছে সে। হাজার হাজার

বছর ধরে মানুষ চাষবাস করছে, কিন্তু একথাটা একবারও তো কারুর মনে হয়নি!

অসম্ভব রকম সোজা উপায়। গাছের জন্যে সূর্যতাপ না হলে চলে না। আর সূর্যের আলো তো আসছে অঢেল। শীতকালে অবশ্য আলো আসে কম, কিন্তু গ্রীষ্মকালে সূর্যতাপের মোটেই অভাব নেই। একরপিছু বেশি শস্য পেতে হলে একরপিছু বেশি সূর্যতাপ ব্যবহার করতে হবে, তার মানে একরপিছু কিছু বেশি গাছ লাগাতে হবে। ব্যস!

কিন্তু কতটা গাছ লাগালে সবচাইতে বেশি পরিমাণ সূর্যতাপ ব্যবহার করা যায়?

ইয়েফ্রেমভ পরীক্ষা শুরু করল। তারই মতো চাষি মজুর ভাইদের সঙ্গে নিয়ে সে কাজ করতে লাগল। অনেকগুলো ছোট ছোট আবাদি জমিতে সে নানাভাবে গমের চারা লাগাল।—কোনোটাতে ঘন ঘন করে, কোনোটাতে ফাঁক ফাঁক করে। হিসেব রাখল কোন জমিতে কতটা চারা লাগিয়েছে।

ইয়েফ্রেমভের নামের পেছনে শিক্ষার কোনো ডিগ্রী ছিল না। কিন্তু তবু তার পরীক্ষা সফল হল। প্রকৃতি তো পোশাকি ডিগ্রী দেখে ভোলে না। প্রকৃতির রহস্য জানার জন্যে যে দরদ দিয়ে প্রকৃতির সাথে মেশে, একাগ্র মনে প্রকৃতিকে বোঝার চেষ্টা করে তার কাছেই প্রকৃতি তার রহস্যের ঝাঁপি খুলে রাখে। ইয়েফ্রেমভ এসব পরীক্ষা দিয়ে প্রমাণ করল, এক-একটা গমের চারার জন্যে দেড় বর্গ ইঞ্চি জমিই যথেষ্ট—তাতেই তার বেড়ে-ওঠার মতো সূর্যের আলো সে পেতে পারে। চাষিরা সব অবাক হয়ে দেখল, এতদিন তারা একরপিছু যত গাছ লাগিয়েছে, আসলে তার পাঁচ গুণ বেশি লাগানো যায়।

ভেবে দেখো, এক চাষির ছেলের বৈজ্ঞানিক দান কত বিরাট রূপ নিয়েছে। এর পর সূর্যকে আয়ত্ত করে পাঁচ একর জমির ফসল এক একরে ফলানো সম্ভব হয়েছে। তরুণ ইয়েফ্রেমভের কাজের ফলে অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র দেশের চেহারা গেছে বদলে।

আজ যে আমরা ইরি ধানকে বলছি জাদুর ধান, সাধারণ ধানের চেয়ে চার-পাঁচ গুণ বেশি ফলে, এর পেছনেও রয়েছে সেই একই কথা। ইরি ধানের বেশি পাতা বেশি সূর্যতাপ শুষে নেয়। এই ধানকে লাগানো হয় ঘন ঘন করে, সার দিতে হয় বেশি—তাই অল্প জমিতে বেশি ফসল ফলে।

তোমরা জানো লেনিন ছিলেন সোভিয়েত রাষ্ট্রের স্রষ্টা। বিজ্ঞানের ভারি চমৎকার একটা প্রস্তাব তাঁর মাথায়ও খেলেছিল।

কয়লা খাদের কথা শুনেছ তো? কয়লা কেটে কেটে তোলা হয় মাটির নিচে বীভৎস রকমের খনি থেকে। ভয়ংকর অস্বাস্থ্যকর এই কয়লার খনি, তার ওপর আবার পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা; যে-কোনো সময়ে দুর্ঘটনা ঘটে হাজার হাজার লোকের প্রাণ যেতে পারে।

লেনিন ভাবলেন, মাটি খুঁড়ে এইভাবে কয়লা তোলা বন্ধ করে দিয়ে কোনো উপায়ে কি লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কষ্ট লাঘব করা যায় না? দেশের বিজ্ঞানী আর ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে পরামর্শ নেবার জন্যে গিয়ে তিনি বললেন ঃ মাইলখানেক মাটির নিচে থেকে কয়লা কেটে তুলে গাড়িতে চাপিয়ে অনেক দূরদেশে নিয়ে চুলোয় ফেলে গ্যাস বানানো, কত হাস্যকর ব্যাপার! তার চাইতে খনির ভেতরে খানিকটা কয়লায় যদি আগুন দিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে গরমে গরমে খনির আগাগোড়া কয়লা আপনা-আপনি গ্যাস হয়ে বেরিয়ে আসবে। তারপর তাকে যেখানে ইচ্ছে পাইপে করে পাঠালেই হল।

তাঁর কথা শুনে ইঞ্জিনিয়ার আর বিশেষজ্ঞরা মাথা নেড়ে বললেন ঃ উঁহুঁ, সে হবার নয়। কিন্তু তবু কাজ শুরু করা হল। ১৯৩৮ সালে বিরাট গোরলোভ্‌কা খনিতে আগুন দেওয়া হল। ফল হল একেবারে আশ্চর্য রকমের!

কয়লার স্তর পর্যন্ত পৌঁছয় এমন দু'টি চোঙা মাটির ভেতরে ঢোকানো হল।—কয়লায় আগুন দেবার পর একটা চোঙা দিয়ে পাখা ঘুরিয়ে হাওয়া নিচে পাঠাতে হয়। যত বেগে হাওয়া পাঠানো হবে, তত বেশি কয়লা পুড়বে, আর তত বেশি তাপও তৈরি হবে। আর একটা চোঙা দিয়ে প্রচণ্ড বেগে গ্যাস বেরিয়ে আসে। এই গ্যাস দিয়ে নতুন একরকমের টারবাইন চালিয়ে খুব সস্তায় বিদ্যুৎ তৈরি করা যায়।

এভাবে কয়লা-খনির নিচে মজুরদের নোংরা কাজ করা বন্ধ হল। খনিমজুরেরা যেদিন গুনল জমির নিচে তাদের কাজ চিরদিনের মতো খতম হয়েছে, সেদিন তারা ফুর্তিতে আত্মহারা হয়ে উঠল। ভাবো দেখি, হাজার হাজার খনিমজুর তাদের কাজ যাচ্ছে বলে খুশিতে লাফাচ্ছে। তার কারণ, তারা বেশ ভাল রকমই জানত, এর পর নতুন এক গ্যাসের শিল্প গড়ে উঠছে আর তাতে তাদের রুটির অভাব হবে না কোনোদিন।

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নয় মানুষকে ভাতে মারা—তার কাজ নয় মানুষের কষ্টের বোঝা বাড়িয়ে গুটিকয়েক মানুষের জন্যে মুনাফা তৈরি। বিজ্ঞানের কাজ হল মানুষের অভাব মেটানো, আর তাদের মেহনতের বোঝা কমানো। হাজার হাজার বিজ্ঞানীর এই হল সাধনা। দুনিয়াজোড়া মানুষের এই হল স্বপ্ন।

সাদা চাল লাল চাল

চকচকে হীরে-জহরত বা সোনা দেখলে কচি শিশুর চোখও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। লোভীর চোখে জ্বলে আগুন। কিন্তু মণি-মানিক কখনো থাকে মাটিতে ঢাকা। তখন হাতে পেলেও আমরা অনেক সময় তাকে চিনতে পারিনে। কাছে পেয়েও পায়ে ঠেলি।

ছেলেবেলার একটি দৃশ্য আজও আমার চোখের সামনে ভাসে। .....গ্রামে থাকি, শহরে পড়ি। বিকেলবেলা স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছি। হঠাৎ দেখি একটা বাড়ির দরজার কাছে পথের পাশে একগাদা ভাত পড়ে রয়েছে। মনে হল, ভাত তো নয় যেন ধবধবে সাদা একরাশ ফোটা বেলফুলের স্তূপ।

সে ১৯৪২ সালের শেষ। তখন দেশে চলছে মহাযুদ্ধ, আর মহাদুর্ভিক্ষ। ভাতের জন্যে চারদিকে মানুষের হাহাকার। রাস্তার ধারে এতগুলো ভাত পড়ে থাকতে দেখে অবাক লাগল। কিন্তু তার চেয়েও অদ্ভুত লাগল ভাতগুলো এমন আশ্চর্য রকম সাদা! চারপাশের নোংরার মধ্যে যেন উজ্জ্বল শুভ্রতায় চিকচিক করে জ্বলছে। .....তারপর বহু বছর কেটে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য, এমন সাদা ভাত আর কখনো আমার চোখে পড়েনি।

এই ঘটনার বছর কুড়ি আগে এমনি সাদা ভাত ভাবিয়ে তুলেছিল রবার্ট উইলিয়ামস নামে এক বিজ্ঞানীকে। উইলিয়ামস জাতে মার্কিন হলেও জন্ম তাঁর দক্ষিণ ভারতে। ছোটবেলায় তাঁর পাদরি বাপের সঙ্গে কাটিয়েছিলেন ভারতের নানা জায়গায়। সেখানে তিনি দেখেছিলেন দুর্ভিক্ষের করাল মূর্তি আর সঙ্গে সঙ্গে বেরিবেরি রোগে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু। বড় হয়ে রসায়নবিদ হিসেবে কাজ শুরু করলেন তিনি ফিলিপাইনের কৃষি বিভাগে। সেখানেও তিনি দেখলেন দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ আর বেরিবেরি।

একটা জিনিস উইলিয়ামসের চোখে পড়ল। শুধু শহুরে লোক নয়, ফিলিপাইনের যারা গরিব লোক, গাঁয়ের চাষি,তারাও পছন্দ করে সাদা চালের ভাত। লাল চালের চেয়ে সাদা চালের দাম বেশি। তবু গরিব লোকেরাও কেনে সাদা চাল—যার ভাত হয় ফরসা ধবধবে, সুন্দর।

বেরিবেরি রোগ নিয়ে উইলিয়ামস নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। এই রোগের প্রথম লক্ষণ হল শারীরিক দুর্বলতা; পা ভারী হয়ে আসে, হাত-পা অবশ আর ঝিনঝিন বোধ হয়। তারপর দু'ধরনের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এক হল রসালো বেরিবেরি—দম নিতে কষ্ট হয়, বুক ধড়ফড় করে। গায়ে পানি জমে। হাত-পা দারুণ ফুলে ওঠে। আর এক হল শুকনো বেরিবেরি। এতে ক্রমে ক্রমে হাত-পায়ের মাংসপেশি শুকিয়ে জীর্ণ হয়ে ওঠে, আঙুলের ডগায় অনুভূতি-শক্তি নষ্ট হয়ে

যায়। শ্বাসকষ্ট হয়; মুখ আর নাকের পাশে নীল হয়ে ওঠে। অবশেষে একদিন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রোগী মারা যায়।

শিশুদের মধ্যে বেরিবেরির ফল হয় মারাত্মক। ফিলিপাইনে শিশুদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই মারা পড়ত এইভাবে। উইলিয়ামস দেখলেন, বিশেষ করে মারা পড়ে যেসব শিশু তোলা-দুধ না খেয়ে মায়ের বুকের দুধ খায় তারা। তিনি ভাবলেন, তাহলে কি মায়ের দুধে কোনো উপাদানের অভাব ঘটছে যার জন্যে শিশুরা সেই দুধ খেয়ে বেরিবেরিতে আক্রান্ত হয়?

অনেক দেখেশুনে উইলিয়ামসের মনে হল সাদা চালের ভাত আর বেরিবেরির মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু সম্বন্ধ আছে। হয়তো চালের ওপরকার লাল আবরণের মধ্যে এমন কোনো উপাদান রয়েছে যা বেরিবেরি প্রতিরোধ করে। বেশি করে ছাঁটা সাদা চালে সেই উপাদানটি থাকে না। তাই সাদা চাল খায় যে-মায়েরা, তাদের বুকের দুধ খেলে ছেলেমেয়েদেরও বেরিবেরি হয়।

সাদা চালের সঙ্গে যে বেরিবেরি রোগের সম্বন্ধ থাকতে পারে সেটা এর ক'বছর আগে এক ওলন্দাজ বিজ্ঞানীও অনুমান করেছিলেন। ক্রিস্টিয়ান আইকম্যান নামে এই ডাক্তার ইন্দোনেশিয়ায় মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষের চাকরি নিয়ে গিয়েছিলেন বেরিবেরি রোগের কারণ খুঁজতে। তখনকার দিনে মনে করা হত সব রোগেরই কারণ হল কোনোরকমের জীবাণু। কিন্তু বেরিবেরির জীবাণু আর তিনি খুঁজে পান না। অবশেষে ১৮৯৬ সালে এক আকস্মিক ঘটনায় তিনি এক নতুন কারণ অনুমান করলেন।

তাঁর গবেষণাগারে মুরগির বাচ্চা দিয়ে নানারকম গবেষণা করা হত। একদিন দেখা গেল পরীক্ষার জন্যে রাখা মুরগির বাচ্চাদের মধ্যে বেরিবেরির মড়ক লেগেছে। অমনি আইকম্যান এইসব অসুস্থ বাচ্চাকে ধরে বেরিবেরির জীবাণুর খোঁজে লেগে গেলেন ; রুগ্ণ বাচ্চা থেকে সুস্থ বাচ্চার শরীরে রোগ ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু আশ্চর্য। জীবাণুর কোনো হদিসই পাওয়া গেল না। তারপর তিনি একদিন অবাক হয়ে দেখলেন, প্রায় ভোজবাজির মতো সব বাচ্চার বেরিবেরি সেরে গিয়েছে। তিনি মস্ত এক ধাঁধায় পড়লেন।

শেষটায় খোঁজ করতে করতে আইকম্যান দেখলেন, মাঝখানে কিছুদিন হাসপাতালের বাবুর্চি চুপিচুপি রোগীদের পথ্যের জন্যে রাখা সাদা চাল মুরগির বাচ্চাদের খাওয়াতে শুরু করেছিল। যখন বাচ্চাদের জন্যে সাদা চালের টান পড়ে যায়, তখন তাদের অসুখও ভাল হয়ে যায়। এই প্রথম আইকম্যানের কাছে মনে

হল, তা হলে এমন রোগও থাকতে পারে যা জীবাণু থেকে হয় না, খাবারে কোনো উপাদানের অভাব থেকে হয়। এরপর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ায় তিনি দেশে ফিরতে বাধ্য হন। তাঁর গবেষণাও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। খাবারে ঠিক কোন উপাদানের অভাব হলে বেরিবেরি হয় তা তিনি বের করতে পারেননি। সে-ভার এসে পড়ে উইলিয়ামসের ওপর।

কিন্তু শুধু অনুমান করলে তো হবে না, সাদা চালে কোন উপাদানের অভাবে বেরিবেরি হয় তা পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করতে হবে। লাল চালের খোসাতেই কি রয়েছে এই উপাদান? কয়েকজন ডাক্তার-বন্ধুর সঙ্গে মিলে উইলিয়ামস চাল-ছাঁটা

লাল আবরণের এক নির্যাস তৈরি করে ব্যবহার করতে শুরু করলেন। প্রথম প্রথম একে ব্যবহার করা হল বেরিবেরি রোগগ্রস্ত কুকুরছানার ওপর। তাতে ভাল ফল পাওয়াতে তখন প্রয়োগ করা হল মানুষের ওপর। দেখা গেল জটিল বেরিবেরিও কিছুদিন এই নির্যাস ব্যবহার করলে সেরে যায়।

কয়েকটি শিশুকে কঠিন বেরিবেরিতে এই নির্যাস খাইয়ে নাটকীয় ফল পাওয়া গেল। এই ওষুধ খাওয়াবার মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যেই থেমে গেল শিশুর প্রায়-শব্দহীন একটানা অস্থির গোঙানি; তারপর কমে এল দম-আটকানো শ্বাসটানা; শান্ত হল নাড়ির এলোমেলো ওঠানামা; স্বাভাবিক হয়ে এল নীল হয়ে ওঠা ঠোঁটের রঙ।

কিন্তু লালচাল-ছাঁটার মধ্যে কী এমন জিনিস আছে যা বেরিবেরি ঠেকাতে

পারে? কেনই-বা এর অভাবে বেরিবেরি হয়? এসব কথা জানা গেল আরও পরে। জিনিসটির নাম দেওয়া হল ভিটামিন বি (এক)। আরও জানা গেল চাল-ছাঁটা লাল আবরণের মধ্যে এই ভিটামিন রয়েছে অতি সূক্ষ্ম মাত্রায়—পঞ্চাশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। একজন বলিষ্ঠ লোকের সারা শরীরে এর পরিমাণ মাত্র এক তোলার পাঁচশো ভাগের এক ভাগ। অথচ এই সামান্য পরিমাণ ভিটামিনও আমাদের স্বাস্থ্যের জন্যে অপরিহার্য। শরীরে এর অভাব বা কমতি হলে নানারকম রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। বেরিবেরি ছাড়াও এর অভাবে হয় নানা জাতের স্নায়বিক রোগ, আর মানুষ তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যায়।

জিনিসটির গুরুত্ব বুঝে এর পর দুনিয়ার নানা দেশের বিজ্ঞানীরা এবার ভিটামিন বি (এক) নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। বহু বিজ্ঞানীর গবেষণার ফলে পানিতে এই ভিটামিনের অপেক্ষাকৃত গাঢ় দ্রবণ পাবার উপায় জানা গেল। তারপর ১৯৩৩ সালে মাত্র কয়েক কণা বিশুদ্ধ ভিটামিন বি (এক) পৃথক করা সম্ভব হল। ১৯৩৪ সালে উইলিয়ামস প্রায় ৩০ মণ লাল আবরণ থেকে এক তোলা ভিটামিন বের করার কায়দা আবিষ্কার করলেন।

এবার বিজ্ঞানীদের চেষ্টা হল এই ভিটামিনের রাসায়নিক গুণাগুণ পরীক্ষা করা। কী কী মৌলিক পদার্থে এটা তৈরি তার রহস্য বের করা দরকার। কথাটা শুনতে যত সহজ আদতে কাজে মোটেই অত সহজ নয়। প্রথমত, একে আগে অতি বিশুদ্ধ আকারে সংগ্রহ করতে হবে, তা নইলে রাসায়নিক স্বরূপ মোটেই শুদ্ধভাবে জানা যাবে না। দ্বিতীয়ত, এই জটিল রাসায়নিক অণুর প্রকৃতি জানতে হলে তাকে ভেঙে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট অণুতে ভাগ করে নিতে হবে। দিনরাত প্রাণপণ পরিশ্রম করে অবশেষে বিজ্ঞানীরা এর মধ্যেকার কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, গন্ধক প্রভৃতি পরমাণুর সংখ্যা বের করতে পারলেন। ভিটামিনটির রাসায়নিক নাম দেওয়া হল থায়ামিন।

রাসায়নিক স্বরূপ জানবার পরে বিজ্ঞানীদের সমস্যা হল কী করে ভিটামিনকে পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা যায়। কৃত্রিম উপায়ে এই ভিটামিন তৈরি করা সম্ভব হলে মানুষের স্বাস্থ্য সাদা চাল লাল চালের ওপর নির্ভর করবে না, আর মায়ের বুকের দুধ খেয়েও শিশুরা অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে না। তখন দেহে উপযুক্ত পরিমাণে ভিটামিন সরবরাহ করা হবে সম্পূর্ণ মানুষের আয়ত্তে।

উইলিয়ামসের বহু দিনের চেষ্টা একদিন সার্থক হল। ১৯৩৬ সালে তিনি সামান্য এক কণা বিশুদ্ধ থায়ামিন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি করতে সক্ষম হলেন। এই এক কণা থায়ামিনের বেরিবেরি প্রতিরোধ ক্ষমতা বিরাট এক স্তূপ চাল-ছাঁটা লাল আবরণের সমান।

এতদিনের চেষ্টায় বিজ্ঞানীদের গবেষণাগারে যে সামান্য পরিমাণ থায়ামিন তৈরি হল, তাকে ক্রমে ক্রমে ব্যাপক আকারে কারখানায় তৈরির পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হল। এবার আর ভিটামিন বি (এক)-এর অভাবে কারও অসুস্থ হয়ে পড়ার কথা নয়। কেননা এমন অবিশ্বাস্য রকম কম খরচে একে কারখানায় তৈরি করা যায় যে, বাজারে ছাড়বার আগে ময়দায়, রুটিতে, চালে একে মিশিয়ে দেওয়া সম্ভব (বিদেশে এর মধ্যেই তা হচ্ছেও)।

শুধু ভিটামিন বি (এক) নয়, এমনি প্রায় গোটা কুড়ি ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণের কথা আজ জানা গেছে। এগুলি দেহের পরিপুষ্টির জন্যে অবশ্য প্রয়োজন। আর তার

মধ্যে গোটা দশেকই রাসায়নিক উপায়ে কারখানায় তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। যেমন, বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের দেহ বাড়বার জন্যে এবং চোখের স্বাস্থ্যের জন্যে অত্যন্ত দরকারি ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' (কড-লিভার তেলে যা প্রচুর পাওয়া যায়); সুঠাম স্বাস্থ্য ও ক্ষয় প্রতিরোধের জন্যে দরকারি ভিটামিন 'সি' (বাতাবি আর লেবুতে রয়েছে প্রচুর); দেহের বৃদ্ধি ও দীর্ঘজীবনের জন্যে দরকারি ভিটামিন বি (দুই), যা টাটকা শাকসবজিতে রয়েছে—এগুলো সবই আজ রাসায়নিক পদ্ধতিতে তৈরি হচ্ছে। আর তাই সস্তায় ভিটামিনের বড়ি বা ভিটামিনজাত ওষুধ আজ সহজেই পাওয়া যায়।

কিন্তু এসব ভিটামিন কৃত্রিম উপায়ে তৈরি হচ্ছে বলেই যে আমরা প্রাকৃতিক ভিটামিনকে নষ্ট করব তার কোনো মানে নেই। টাটকা শাকসবজির বদলে বাসি শাকসবজি খেয়ে তারপর ভিটামিন গেলার কোনো অর্থ হয় কি? ভিটামিনওলা অল্প ছাঁটা চালের বদলে ফরসা ধবধবে চাল ব্যবহার করাও অনেকটা তেমনি। এও কি হাতের কাছে সোনা পেয়ে তাকে পায়ে ঠেলে দেবার মতোই নয়?

bi

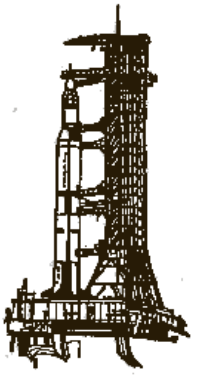

আসল চাঁদ আর নকল চাঁদ

"আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা।
খোকার কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা।"

চাঁদের টিপ না পেলে খোকনের আমাদের ঘুম আসে না। রোজ রাতে তার কপালে চাঁদের টিপ পড়বে, তাবে সে মায়ের কোলে মাথা রেখে চোখ বুজবে।

কিন্তু এই দস্যি ছেলের জন্যে রোজ রোজ এখন চাঁদ পাওয়া যাবে কোথায়? পূর্ণিমার কাছাকাছি ক'দিন সন্ধেবেলা নারকেল গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে বড় সড় চাঁদ ওঠে। খোকনমণি চাঁদ ধরতে হাত বাড়ায়, চাঁদ দেখে তাই তাই দেয়। তা বলে মাসের তিরিশটা দিনই কি আর চাঁদ পাওয়া যায়?

অথচ খোকনকে বোঝানো দায়। সে তখন খাবে না, দাবে না, ঘুমোবে না; কেবল চাঁদ চাঁদ বলে কান্না জুড়বে।

অতএব? একটা চাঁদে চলছে না। আমাদের আরও চাঁদ চাই।

এমন চাঁদ চাই যা কখনো ডোবে না, কখনো অমাবস্যায় ঢেকে যায় না—তিরিশ দিন আকাশে হাসতে থাকে। অর্থাৎ আমাদের আরও নতুন রকমের চাঁদ চাই। এমন চাঁদ যা মানুষের কথামতো আকাশে ওঠে, আবার কথামতো নেমে আসে। যা সারাক্ষণ পূর্ণিমার চাঁদের মতো গোল হয়ে থাকে, কখনো ক্ষয় হতে হতে কাস্তের মতো হয়ে যায় না। এমন চাঁদও কি আবার হয় নাকি কখনো?

অবাক কাণ্ড! বিজ্ঞানীরা বললেন, হ্যাঁ, এমন চাঁদও হয়। না, হাসিঠাট্টার কথা নয়। সত্যি সত্যি তাঁরা লেগে গেলেন এরকম চাঁদ বানাতে।

১৯৫৭ সালের কথা। আমেরিকা আর সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা ডজন-খানেক এমনি নকল চাঁদ বানাতে শুরু করেছেন। বিরাট রকেট-দৈত্যের সাহায্যে ছুঁড়ে দেওয়া হবে এসব চাঁদ, তারপর সেগুলো সত্যিকার চাঁদের মতোই ঘুরপাক খেতে শুরু করবে পৃথিবীর চারপাশে।

বিজ্ঞানীরা বললেন, আসলে চাঁদের চেয়ে এগুলো ঘুরবে অনেক তাড়াতাড়ি। দিন-রাতে চাঁদ মাত্র একবার ঘোরে পৃথিবীর চারপাশে। কিন্তু এই নকল চাঁদ দিন-রাতে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরবে ষোলোবার; অর্থাৎ দেড় ঘন্টা পরপরই এরা আমাদের মাথার ওপর দেখা দেবে। সেজন্যে ছুটতেও হবে এদের প্রচণ্ড গতিতে—ঘণ্টায় আঠারো হাজার মাইল বেগে। মানুষের তৈরি কোনো জিনিস এর আগে আর কখনো এত তাড়াতাড়ি ছোটেনি।

এমন নকল চাঁদ মানুষ আগে আর কখনো বানাতে পারেনি। কাজেই দুনিয়াসুদ্ধ লোকে তো প্রথমটায় বিশ্বাসই করতে চাইল না যে এমন চাঁদ আদৌ বানানো যাবে। চাট্টিখানি কথা তো নয়! বিরাট একটি গোলা, তাকে ছুড়ে দিতে হবে পৃথিবীর তিন-চারশো মাইল ওপরে। তাও আবার এমন জোরে ছুড়তে হবে যেন সেটা অনবরত পৃথিবীর চারপাশে ঘুরপাক খেতে থাকে—মাটিতে পড়ে না যায়।

আমাদের আশেপাশের সব জিনিসকে পৃথিবী তার মাধ্যাকর্ষণের টানে আষ্টেপৃষ্ঠে নিজের পিঠের ওপর এঁটে রেখেছে। আমরা ওপর দিকে লাফ দিলে

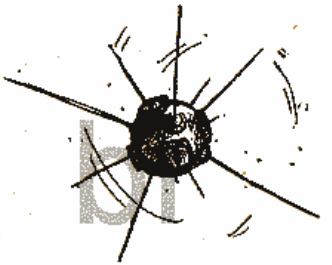

আবার মাটিতে এসে পড়ি এই আকর্ষণেরই জন্যে—একথা বলেছিলেন আইজাক নিউটন। দুনিয়ার সবচেয়ে মাথাওয়ালা বিজ্ঞানীরা বহুকাল থেকে মাথা ঘামাচ্ছেন কী করে মাধ্যাকর্ষণের এই প্রবল টানকে কাটিয়ে মহাশূন্যে বেরিয়ে পড়া যায়, কিন্তু তার জন্যে দরকার বিষম জোরে ছুট লাগাবার যন্ত্র। সে তো যে-সে ছুট নয়; পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে—অর্থাৎ প্রায় তিনশো মাইল রাস্তা—একদম পেরিয়ে যাওয়া চাই। তা নইলে বায়ুমণ্ডলের ঘষা আবার কান ধরে হিড়হিড় করে পৃথিবীর ওপর টেনে নামাবে।

শুরু হল এমনি জবর ছুট লাগাবার যন্ত্র—রকেট তৈরির কাজ। বিরাট লম্বা রকেট। প্রায় দশতলা দালানের সমান উঁচু; তিন-চারশো মণ ওজন। আসলে এই রকেটের মধ্যে থাকবে তিনটে আলাদা রকেট-দৈত্য। পৃথিবীর কাছাকাছি ঘন বাতাসের তিরিশ-চল্লিশ মাইল পেরোতে পেরোতেই প্রথম দৈত্যের দম ফুরিয়ে যাবে। অমনি শুরু হবে দ্বিতীয় দৈত্যের কাজ। সোয়াশো-দেড়শো মাইল উঠে দ্বিতীয় দৈত্যও হাঁপিয়ে উঠবে। তখন ভার পড়বে তৃতীয় দৈত্যের ওপর। তৃতীয় দৈত্য নকল চাঁদকে কাঁধে নিয়ে পৌঁছে দেবে বায়ুমণ্ডলের বাইরে—তিনশো মাইল

ওপরে। তারপরে সেটা ঘুরতে শুরু করবে পৃথিবীর চারপাশে, পৃথিবীর নকল চাঁদ হয়ে।

এমনি সব জল্পনা-কল্পনা চলছে ১৯৫৭ সালে। সত্যি সত্যি এত জোরালো রকেট কি মানুষ তৈরি করতে পারবে? এত জোরে গোলা ছুড়তে পারলেও তা কি সত্যি সত্যি চাঁদ হয়ে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরপাক খেতে থাকবে!

এমনি সময় ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর ঘটল এক অবাক কাণ্ড। সারা দুনিয়াকে চমক লাগিয়ে দিয়ে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা আকাশে ছুড়লেন প্রথম স্পুতনিক। দুনিয়ার প্রথম নকল চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে পাক খেতে শুরু করল। গোলাটা চওড়ায় ছিল ২৩ ইঞ্চি, আর ওজন ছিল দু'মণ দশ সের। তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি চালাবার জন্যে বিদ্যুৎ তৈরির ব্যাটারির ওজনই ছিল এক মণের কাছাকাছি।

ঠিক বিজ্ঞানীদের হিসেবমতো পৃথিবীর চারদিকে দেড় ঘণ্টায় একবার করে ঘুরতে লাগল এই চাঁদ।

শুধু তা-ই নয়, সাথে সাথে তার শেষ স্তরের রকেটটিও ঘুরতে থাকল পৃথিবীর চারপাশে। সকাল-সন্ধ্যায় সূর্যের তেরচা আলো পড়ে রকেটটি এমন চকচক করতে লাগল যে সারা দুনিয়ার মানুষ দেখতে পেল তাকে। সত্যি সত্যি যে এক নতুন চাঁদের উদয় হয়েছে তাতে আর কোনো সন্দেহই রইল না। স্পুতনিকের বেতারযন্ত্র থেকে যে বিপ্‌বিপ্‌ আওয়াজ হতে লাগল তাও তেইশ দিন ধরে শোনা গেল সারা দুনিয়া থেকে।

এক মাসের মধ্যেই (তেসরা নভেম্বর) আকাশে উড়ল দ্বিতীয় স্পুতনিক। এটা আরও বড়, আরও ভারী—১৪ মণ এর ওজন। আর এ শুধু চাঁদ নয়; এর বুকে চড়ে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে লাগল 'লাইকা' নামে একটা জ্যান্ত কুকুর। তার ওপর রকেটের শেষ স্তরটি এবার আটকে রইল স্পুতনিকের সঙ্গেই। শেষ স্তরের ওজন হল ৭৪ মণ। কাজেই দ্বিতীয় স্পুতনিককে খালিচোখে দেখা আরও সহজ হল।

আমেরিকাও একেবারে পিছিয়ে রইল না। মাস তিনেকের মধ্যে মার্কিন বিজ্ঞানীরা ছুড়লেন প্রথম 'এক্সপ্লোরার' উপগ্রহ। অবশ্য এর আকার ছিল অনেক ছোট; ওজনও অনেক কম—মাত্র ১৫ সের। তবে এতে অনেক যন্ত্রপাতি বসানো ছিল পৃথিবীর ওপরকার বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে নানা খবরাখবর সংগ্রহ করার জন্যে।

বছর দু-একের মধ্যেই আসল চাঁদ আর নকল চাঁদে লাগল ঠোকাঠুকি। ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের পাঠানো লুনিক-২ (প্রায় সাড়ে দশ মণ ওজন) সত্যিকার চাঁদের বুকে গিয়ে নামল। তার কয়েকদিন পরেই লুনিক-৩ (প্রায় পঞ্চাশ মণ ওজন) চাঁদের উলটো পিঠের ফটো টেলিভিশনের সাহায্যে পৃথিবীতে পাঠাল। মানুষের কাছে এই প্রথম এল চাঁদের অদৃশ্য পিঠের রহস্যঘেরা ছবি।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে ঃ আচ্ছা, ১৯৫৭ সালেই নকল চাঁদ তৈরির জন্যে এমন বিরাট আকারে ভোড়জোড় শুরু হল কেন? সোভিয়েত ইউনিয়ন আর আমেরিকা যে একযোগে উঠেপড়ে লাগল নকল চাঁদ বানাতে তার নিশ্চয়ই কিছু একটা বিশেষ অর্থ আছে।

বলাবাহুল্য, আয়োজনটা হঠাৎ হয়নি। অনেকদিন ধরে বেশ উদ্যোগ-আয়োজন

করার পর সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা মিলে ১৯৫৭ সালে একযোগে প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন করার এক মহা-অভিযানের পরিকল্পনা করেন।

বিজ্ঞানীরা বললেন ঃ কয়েক হাজার বছরের চেষ্টায় পৃথিবীর নানা কথা আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু এখনও পৃথিবীতে এমন অজস্র ব্যাপার আছে যার কথা আমরা কিছুই জানিনে।

কিন্তু এ-অবস্থা চলতে পারে না। পৃথিবীর সব কথাই আমাদের জানতে হবে। জানতে হবে পৃথিবীর চারপাশে বিশ্ব-প্রকৃতির কথা। একা একা আলাদা আলাদাভাবে চেষ্টা করে অনেক কথা জানা যায় না। পৃথিবীর এক প্রান্তের ঘটনার জের হয়তো রয়েছে পৃথিবীর আর এক প্রান্তে। কাজেই একযোগে দুনিয়াজোড়া অভিযান চালাও। জল-স্থল আকাশ-বাতাসে পৃথিবীর কোনো এলাকাই বাদ যাবে না এই অভিযান থেকে।

আবিষ্কারের অভিযান। পৃথিবীর রহস্য জেনে পৃথিবীকে জয় করার অভিযান। সারা দুনিয়ার হাজার হাজার বিজ্ঞানী অজানাকে জানবার, এসব জ্ঞান কাজে লাগিয়ে মানুষের জীবনকে আরও সুন্দর করবার জন্যে এই অভিযানে হাত লাগালেন।

হিসেব করে দেখা গেল ১৯৫৭ সালের জুলাই মাস থেকে সূর্যের গায়ে সৌর-কলঙ্ক বেড়ে যাবে। সৌর-কলঙ্ক বাড়লে পৃথিবীর ওপরেও নানাভাবে তার প্রভাব দেখা দেয়। মনে হয় সূর্যের গায়ে আগুনের ঝড় উঠে যেন পৃথিবীর ওপর বিদ্যুতের কণা ছিটকে এসে পড়তে থাকে। এ-সময় বিরাটভাবে মেরুজ্যোতি ঝলসে ওঠে। এক দেশ থেকে আরেক দেশে বেতার-যোগাযোগে নানা উৎপাত দেখা দেয়। এসব ব্যাপারের কারণকে বুঝতে হবে।

১৯৫৭ সালের জুলাই থেকে ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত আঠারো মাস সময় বিজ্ঞানীদের জন্যে বিশেষ তাৎপর্যভরা। এই সময়ে শুধু যে সৌর-কলঙ্ক বাড়বে তা-ই নয়, এই আঠারো মাসে পরপর ঘটবে একসঙ্গে অনেকগুলো গ্রহণ। কাজেই ঠিক করা হল এই সময়েই শুরু করতে হবে বিজ্ঞানীদের দুনিয়াজোড়া গবেষণা আর রহস্যের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক অভিযান।

সত্যি এ এক ঐতিহাসিক অভিযান। কেননা, পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় অভিযানের কথা এর আগে আর কখনো শোনা যায়নি। দুনিয়ার ৬৬টি দেশ যোগ দিয়েছে এই অভিযানে। প্রায় ৬০,০০০০ বিজ্ঞানী অংশ নিয়েছেন পৃথিবী সম্বন্ধে নানা ধরনের পরীক্ষায়। দুনিয়ার নানা জায়গায় অন্তত চার হাজার বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র থেকে বিজ্ঞানীরা নানা ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। এইসব কেন্দ্রের কোনোটি উত্তর মেরুর ভাসন্ত বরফের খণ্ডের ওপর, কোনোটি দক্ষিণ মেরুর বিজন বরফের মরুভূমিতে; কোনোটি দুর্গম পাহাড়ের চূড়োয়। কোনোটি বা মহাসাগরের বুকে কোনো ছোট্ট প্রবালদ্বীপে।

আকাশে কৃত্রিম চাঁদ পাঠানো এই বিরাট দুনিয়াজোড়া অভিযানেরই অঙ্গ। এই চাঁদের বুকে পুরে দেওয়া হল নানা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। এর ওপরের হালকা ধাতুর পাত দিয়ে তৈরি খোলসের ভেতরটা সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে থাকল ঠাসা। তাতে অবাক হবার কিছু নেই। বিজ্ঞানীরা তো আর শুধু চাঁদের শোভা দেখার জন্যে এদের আকাশে পাঠাচ্ছেন না! তাঁদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীর বাইরের মহাকাশের অবস্থা কেমন, সেখানে মানুষ যেতে পারে কি না এসব সম্বন্ধে খবরাখবর

যোগাড় করা।

তাই চাঁদের ভেতর পোরা হল এমন সব স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি যেগুলো আপনা-আপনি মহাকাশের সব অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য যোগাড় করে সে-খবর আবার সঙ্গে সঙ্গে বেতার-সংকেতের মারফত পৃথিবীতে বিজ্ঞানীদের কাছে পৌঁছে দেবে। মহাশূন্যে পৃথিবী থেকে বিভিন্ন দূরত্বে হাওয়ার ঘনত্ব কত, কেমন সেখানকার তাপ, বিদ্যুৎ কণার পরিমাণ, পৃথিবীর চৌম্বকশক্তির আকর্ষণ—এমনি আরও কতকিছু।

তা ছাড়া পৃথিবীর ঘন বায়ুমণ্ডল আর মেঘের ঢাকার জন্যে পৃথিবীর বুক থেকে বাইরের বিশ্বের দৃশ্য খুব ভাল দেখতে পাওয়া যায় না—খুব শক্তিশালী দূরবীন দিয়েও নয়। এই বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৃথিবীর বাইরে কোনো নকল চাঁদের ওপর আস্তানা গাড়তে পারলে বাইরের বিশ্বের বহু খবর যোগাড় করা হয়ে পড়বে অনেক সহজ।

১৯৫৭ সালে প্রথম স্পুতনিক ছোড়ার পর থেকে এদিকে মানুষ অনেক দূর এগিয়েছে। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার অ্যাপলো-৮ নভোযানে চেপে তিনজন নভশ্চর পৃথিবী থেকে আড়াই লক্ষ মাইল দূরে সত্যিকার চাঁদের চারপাশে ঘুরপাক খেয়ে এসেছেন। এই অ্যাপলো নভোযানের ওজন ছিল প্রায় ১২০০ মণ। প্রায় পঁয়ত্রিশ তলা দালানের সমান (৩৬৩ ফুট) উঁচু যে স্যাটার্ন রকেটের সাহায্যে এই নভোযান ছোড়া হয়েছিল তার ওজন প্রায় ৭৫,০০০ মণ।

এরপর তিন সপ্তাহ যেতে-না-যেতেই সোভিয়েতের সয়ুজ-৪ ও সয়ুজ-৫ নভোযান দু'টি মহাকাশে উড়তে উড়তে একসঙ্গে জোড়া লেগেছে। সয়ুজ-৫ থেকে দু'জন নভশ্চর বেরিয়ে এক ঘণ্টা করে বাইরে কাটিয়ে সয়ুজ-৪-এ ঢুকেছেন। সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর বাইরে মহাশূন্যে পাড়ি দেবার মতো প্রথম আস্তানা। ক্রমে ক্রমে একদিন গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে পাড়ি দেবার জন্যে মানুষ ব্যবহার করবে এমনি নভোলোকের আস্তানা।

এর পর ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে মার্কিন নভশ্চর আর্মস্ট্রং আর অলড্রিন গিয়ে নেমেছেন চাঁদের বুকে।

মহাকাশের পথে পাড়ি দেওয়া ছাড়াও নকল চাঁদ এখনই মানুষের অনেক কাজ দিয়েছে। এসব চাঁদ থেকে দিনরাত তোলা হচ্ছে পৃথিবীর ওপরকার অসংখ্য ছবি। এসব ছবি থেকে অনেকগুলো সাইক্লোনের হদিস পাওয়া গিয়েছে। আর তার ফলে যেসব জায়গা দিয়ে সাইক্লোন যাবে সেখানকার লোকদের আগে থেকে সাবধান করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

নকল চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে কতক্ষণ সময় লাগবে সেটা নির্ভর করে পৃথিবী থেকে তার দূরত্বের ওপর। হিসেব করে দেখা গিয়েছে পৃথিবী থেকে ২২,৩০০ মাইল দূর দিয়ে যদি চাঁদের পথ হয় তা হলে তার একপাক ঘুরতে সময় লাগবে চব্বিশ ঘণ্টা। অর্থাৎ পৃথিবী তার মেরুদণ্ডের ওপর যতক্ষণে ঘুরবে এই চাঁদও ততক্ষণে সাথে সাথে ঘুরে আসবে একপাক। শেষমেষ ফল হবে এই যে, নকল চাঁদ আর কখনো ডুববে না; মনে হবে দিনরাত মাথার ওপর আকাশের এক জায়গায় স্থির হয়ে রয়েছে।

সত্যি সত্যি এমনি স্থির হয়ে থাকা নকল চাঁদও তৈরি হয়েছে। আর এই চাঁদে ঠিকরে দিয়ে এক দেশ থেকে টেলিভিশনের ছবি বা টেলিফোনের কথা পাঠানো হচ্ছে দূরের আরেক দেশে। ভারত মহাসাগরের ওপরও এমনি স্থির চাঁদ ওড়ানো হয়েছে। বেতবুনিয়া আর তালিমাবাদ উপগ্রহ-কেন্দ্রের মারফত আমরা আমাদের টেলিভিশনে সরাসরি বিদেশের অনুষ্ঠান দেখছি; বিদেশে সরাসরি টেলিফোনে ডায়ালিং করাও যাচ্ছে।

খোকন যে দিনরাত চাঁদের বায়না ধরে, এমন চাঁদ মানুষ এর মধ্যেই বানিয়ে ফেলেছে অনেক, আর হরেকরকম কাজেও লাগাচ্ছে তাদের।

bi

আমি হতে চাই একজন বিজ্ঞানী

একটি ছোট্ট ছেলে আমার কাছে চিঠি লিখেছে ঃ আমি একজন বিজ্ঞানী হতে চাই। দয়া করে জানাবেন, বিজ্ঞানী হতে হলে কী কী করতে হয়।

সত্যি তো, কেমনতরো বিজ্ঞানীদের চেহারা? কী তাঁদের কাজের ধারা? বিজ্ঞানীরা আমাদের দশজনের বাইরে অদ্ভুত কিছু কি?

অনেকগুলো পেশা আছে যাদের কথা মনে করলে আমাদের চোখের সামনে এক-একটা ছবি ভেসে ওঠে। ছবিটা কখনো সত্যি, কখনো পুরোপুরি সত্যি নয়।

যদি বলি ডাক্তার অমনি মনে পড়বে একটি লোককে। গলায় ঝোলানো স্টেথস্কোপ—হাতে ওষুধপত্র-ভরা একটি ব্যাগ। হয়তো ঘাড় উঁচিয়ে বলছেন ঃ খোকা, জিবটা বের করো দেখি।

কিংবা বললাম, অমুক যে কবি। তা হলে হয়তো তার পায়ে থাকবে একজোড়া স্যান্ডেল। গায়ে ঢিলে পাঞ্জাবি। তেলবিহীন লম্বা চুল। একজোড়া চশমার পেছনে উদাসীন দৃষ্টি।

খাকি শার্ট পরা, বুট পায়ে—এমন লোক পুলিশ হতে পারে। কিন্তু কবি? ভাবতে কষ্ট হয়।

আর বিজ্ঞানী?

এককালে মনে পড়ত রবীন্দ্রনাথ পরশপাথর-খোঁজা খ্যাপা সন্ন্যাসীর যে-বর্ণনা দিয়েছেন তার কথা। মাথায় রুক্ষ জটাজাল। লম্বা দাড়ি-গোঁফ নেমেছে যেন বটের ঝুরি। গায়ে মাখা ছাই ধুলো। আর লোকটি পাগলের মতো কুড়িয়ে-বেড়াচ্ছে পাথরের নুড়ি ঃ যদি হঠাৎ পাওয়া যায় সেই স্পর্শমণি যার ছোঁয়ায় লোহা হয়ে যায় সোনা।

আজকের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে এই পরশপাথর-খোঁজা খ্যাপা সন্ন্যাসীর তফাত অনেক। তবু আজও বিজ্ঞানী শুনলেই মনে পড়ে এমন একটি লোককে, যার হয়তো মাথায় থাকবে টাক। চোখে পুরু কাচের চশমা। নাওয়া-খাওয়ার কথা কিছুই মনে নেই। চোখ লেপটে রয়েছে একটি যন্ত্রের কম্পমান কাঁটার ওপরে। হয়তো খাবার জন্যে ডিম সেদ্ধ করতে গিয়ে ভুলে সেদ্ধ করেছেন ট্যাকের ঘড়িটাই।

নাঃ! সুবিধের ঠেকছে না ব্যাপারটা। এই যদি হয় বিজ্ঞানীদের ছবি, তা হলে আর বিজ্ঞানী হয়ে কী হবে? তার চেয়ে বরং সাদামাটা মুদি কিংবা ঠিকেদার হওয়া ভাল।

bi

আসলে এইটেই বিজ্ঞানীদের একমাত্র ছবি নয়। বিজ্ঞানীরা অনেক যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করেন। কবিরা যেমন কথার মুক্তো দিয়ে মালা গাঁথেন।

বিজ্ঞানীরা চিন্তায় ডুবে অনেক সময় আপনভোলাও হন। যেমন হন কবি কিংবা কখনো রাস্তার পুলিশ। বা দোকানের মুদি, আদালতে জজ।

জজ আর মুদি আর পুলিশের মতো কবি আর বিজ্ঞানীরাও এই দুনিয়ারই মানুষ। দেখতেও তাঁদের আরসব মানুষের মতনই। ধোপদুরস্ত কাপড়-পরা তাগড়া জোয়ান দৈত্যের মতো চেহারার লোকও কবি হতে পারে। আবার ছুঁচলো বিষয়-বুদ্ধি নিয়ে, আর পাঁচজনের মতো রীতিমতো ঘর-সংসার করে বিজ্ঞানী হতেও কিছু বাধা নেই।

বিজ্ঞানীদের বৈশিষ্ট্য তাঁদের চেহারায় নয়। পোশাকেও নয়। তাঁরা ভোরে ক'টায় ঘুম থেকে ওঠেন, রোজ ক'গ্লাস পানি খান ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটিতেও নয়। বিজ্ঞানীদের বৈশিষ্ট্য হল তাঁদের কাজে।

দেশের চলতি আইন অনুযায়ী দুষ্টের দমন আর শিষ্টের রক্ষণ হল পুলিশের কাজ। আইনের মাপকাঠিতে নিজের মক্কেলকে সত্যবাদী সাব্যস্ত করে জিতিয়ে দেওয়া উকিলের কাজ। খরিদ্দারের মন যুগিয়ে তার প্রয়োজনের জিনিস সরবরাহ করা মুদির কাজ।

কিন্তু বিজ্ঞানীর কাজটা কী? —এক কথায় বলতে গেলে ঃ বিশ্বচরাচরে সত্যের গোপন ভাণ্ডারকে উন্মুক্ত করা। কথাটা একটু ভারী হয়ে গেল। কিন্তু এর চাইতে সহজ করে বিজ্ঞানীদের কাজ বোঝাবার আর কোনো উপায়ও তো দেখছিনে।

সত্যের রূপ বিচিত্র।

সত্য হতে পারে মানুষের বাইরে বিশ্বলোকে। কিংবা মানুষের নিজেরই বিষয়ে। অথবা বহু মানুষকে নিয়ে যে-সমাজ তাকে কেন্দ্র করে। সত্য হতে পারে বস্তু বা ঘটনা বা বাস্তব অবস্থার বর্ণনা। অথবা অনেকগুলো বাস্তব অবস্থার বর্ণনা থেকে পাওয়া একটি সাধারণ নিয়ম বা সূত্র।

সত্যকে কখনো মন থেকে আনকোরা তৈরি করা যায় না। বিশ্বচরাচরে সত্য আগে থেকেই তৈরি হয়ে আছে। আবার সব সত্য সব সময় স্থির হয়েও থাকে না। বিশ্বের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সত্যেরও রূপান্তর ঘটছে। সেই সত্যকে নিত্য নতুন রূপে উদ্‌ঘাটন করার দায়িত্ব বিজ্ঞানীদের।

তা হলে বিজ্ঞানীদের সত্যিকার রূপ জানতে হলে আমাদের জানতে হবে কী করে তাঁরা এই সত্যকে আবিষ্কার করেন তার কথা।

সব বিজ্ঞানী যে হুবহু একই পথ ধরে সত্যের সন্ধান করেন, এমন নয়। মানুষে মানুষে যেমন রুচির তফাত হয়, পোশাকের তফাত হয়, তেমনি বিজ্ঞানীদের মধ্যে সত্য-সন্ধানের কায়দারও তফাত আছে। তবে বহু বিজ্ঞানীর কাজের ধারা পরীক্ষা করলে তাঁদের কাজের পদ্ধতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়।

প্রথমত, বিজ্ঞানীদের অনেককিছু পড়তে হয়। আর যে যা-ই করুন না কেন, অনেক না পড়ে আজকের দিনে কোনো বিজ্ঞানীই কাজে এগুতে পারেন না। নতুন কোনো বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে হলে এর আগে সে-বিষয়ে যেসব তথ্য

উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, সে-সম্বন্ধে সবকিছু জানতে হবে। এ থেকে জানা যায় এর আগের বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণায় যে-অসুবিধের সম্মুখীন হয়েছেন, তার কথা। অনেক সময় তাঁরা যেসব তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে পারেননি তার কথাও। হয়তো কেউ গবেষণা অসম্পূর্ণ রেখেই ক্ষান্ত হয়েছেন। হয়তো কেউ ইঙ্গিত করে গিয়েছেন কোনো অনুসন্ধানের সূত্রের। এসবই সাহায্য করে নতুন গবেষণা শুরু করতে।

দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞানীদের চারদিকে খোলা নজর রাখতে হয়। প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে আছে নানা রহস্য। সাধারণের চোখে হয়তো তার সব ধরা পড়ে না। কিংবা ধরা পড়লেও সে-রহস্য উদ্ধারের কৌশল সবার জানা নেই। আগের বহু বিজ্ঞানীর অনুসন্ধানে পাওয়া জ্ঞানের সাহায্যে সাধারণ জিনিসের মধ্যেও অনেক নতুন জিনিস বিজ্ঞানীদের চোখে পড়ে, যা থেকে নতুন সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়।

শুধু নজর খোলা রেখে চারদিকে পর্যবেক্ষণ করলেই চলবে না। বিশেষ অবস্থার মধ্যে অনেক সময় বিজ্ঞানীদের বিশেষ কায়দায় পরীক্ষা করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই এই বিশেষ অবস্থা তৈরি করা হয় পরীক্ষাগারে, যেখানে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা চলে। হয়তো এই বিশেষ অবস্থা সৃষ্টির জন্যে দরকার হবে বিশেষ রকমের যন্ত্র। বিশেষ রকম তাপ বা চাপ। বিশেষ রকমের আবহাওয়া বা বিশেষ রকমের আর কিছু।

কখনো কখনো এই বিশেষ অবস্থা পাওয়া যায় পৃথিবীর ওপরেই, তবে হয়তো খুব দুর্গম জায়গায়। তখন বিজ্ঞানীদের বেরোতে হয় দুঃসাহসিক অভিযানে। এই দুর্গম জায়গা হতে পারে আমাজনের জঙ্গল, তুহিন-শীতল মেরু অথবা হিমালয়ের নগ্ন চূড়ো। পৃথিবীর বাইরে মহাশূন্যে বা পৃথিবী থেকে বহু লক্ষ বা কোটি মাইল দূরের গ্রহে-উপগ্রহে। সত্যের সন্ধানে জীবনকে বিপন্ন করে বিজ্ঞানীদের উড়তে হয় আকাশে, ঢুকতে হয় পাহাড়ের গহ্বরে অথবা গহন অরণ্যে।

সাদা চোখে আমরা দেখি মোটামুটিভাবে। কিন্তু মোটামুটি দেখা বা মোটামুটি জানা দিয়ে বিজ্ঞানের কারবার চলে না। বিজ্ঞানীদের দেখতে হবে, জানতে হবে বিশেষভাবে। এই বিশেষভাবে দেখা, বিশেষভাবে জানার জন্যে দরকার হয় বিশেষ রকমের মাপজোক, বিশেষ রকমের সঙ্কেত আর সূত্র। তাই বিজ্ঞানীদের ভাষা অনেক সময় জটিল আঁকিবুকিতে ভরা। নির্দিষ্ট ভাব নির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করার

জন্যেই তাঁদের এই বিশেষ অঙ্কের সংকেত আর বিশেষ ভাষার প্রয়োজন দেখা দেয়।

এ ছাড়া, বিজ্ঞানীদের ভাবতে হয় অনেক। শুধু পর্যবেক্ষণ আর পরীক্ষা করে তথ্য সংগ্রহ করলেই হবে না। অনেক ভেবে ভেবে তাঁদের বার করতে হয় নতুন রকম পর্যবেক্ষণের কায়দা, নতুন পরীক্ষার কৌশল, যাতে যে-রহস্য আজও ধরা পড়েনি তা ধরা পড়তে পারে। নানা পরীক্ষা পর্যবেক্ষণে পাওয়া তথ্যের সমন্বয় ঘটিয়ে অনেক ভেবে বার করতে হয় কী করে প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যাখ্যা দিয়ে নতুন সূত্র তৈরি করা যায়। আগের জানা তথ্যের ভিত্তিতে কল্পনার রঙ ছুঁইয়ে বিজ্ঞানীদের অনুমান করতে হয়—কী হতে পারে অজানা সত্যের রূপ, কেমন দাঁড়াতে পারে ভবিষ্যতের দুনিয়ার চেহারা।

বিজ্ঞানীদের লিখতেও হয় অনেক। শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে হবে না। তার কথা অন্যকেও জানাতে হবে। শুধু জানালে হবে না। এমন স্পষ্ট ভাষায় জানাতে হবে যাতে সে-পরীক্ষার সত্যতা সম্বন্ধে কারও মনে সংশয় দেখা দিতে না পারে, আর যে-কেউ ইচ্ছে করলেই যেন সে-পরীক্ষাটি আবার নিজে করে নিশ্চিত হতে পারেন। পরীক্ষায় পাওয়া তথ্য থেকে যে-সিদ্ধান্তটি করা হল, তার মধ্যে যুক্তির ফাঁক যেন একেবারেই না থাকে।

সমাজের চলতি মতামতের সঙ্গে বিজ্ঞানীর নতুন আবিষ্কৃত সত্যের যদি গরমিল হয়, তা হলে লোকে তার কথা সহজে মেনে নিতে চায় না। তখন তাতে দমে না গিয়ে নতুন সত্য সাধারণের মধ্যে প্রচার করার জন্যেও বিজ্ঞানীকে কলম ধরতে হয়।

বিজ্ঞানীদের বক্তৃতা আর আলোচনাতেও অংশ নিতে হয়। একই দেশের নানা অংশে নানান বিজ্ঞানী হয়তো সাধনা করে যাচ্ছেন একই সত্যের সন্ধানে। নানা দেশের বিজ্ঞানীরা হয়তো কাজ করছেন একই বিষয় নিয়ে। পরস্পরের সহায়তার জন্যে তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তাতে বিজ্ঞানীরা তাঁদের নতুন গবেষণার কথা বা নতুন আবিষ্কারের কথা আর দশজনেক জানাতে পারেন। নিজের নতুন কোনো মতবাদের ওপরে অন্য সবার অভিমত জানতে পারেন। একজন অন্যের ভুল সিদ্ধান্তের খণ্ডন করে সঠিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

বিজ্ঞানীদের সমবেত চেষ্টায় যেসব আবিষ্কার হয়েছে তার অপপ্রয়োগ করে যাতে কেউ মানুষের অকল্যাণ ডেকে আনে না, তার জন্যেও বিজ্ঞানীদের অনেক সময় সংঘবদ্ধ হয়ে চেষ্টা চালাতে হয়। আর এজন্যেও বক্তৃতা, আলোচনা, সম্মেলন ইত্যাদির মারফত বিজ্ঞানীদের মধ্যে খোলাখুলি ভাবের আদান-প্রদান হওয়া একান্ত দরকার।

বিজ্ঞানীদের মতো পড়াশোনা করতে হয় ইস্কুলের ছাত্র-মাস্টার সবাইকে।

মুদিকেও জিনিস বেচবার সময় দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ওজন করতে হয়। বিজ্ঞানীকে হরেকরকম মাপজোকের কাজ করতে হয়—মুদির চেয়ে আরও অনেক সূক্ষ্মভাবে।

বিজ্ঞানীকে সত্যের সন্ধানে বেরোতে হয় দুঃসাহসিক অভিযানে। নতুন সত্যের পেছনে নির্ভীকভাবে দাঁড়াতে হয় অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে। পুলিশকেও ধৈর্য আর সাহসিকতার পরিচয় দিতে হয়—দুষ্টের দমন করতে গিয়ে।

ঘটনা বা তথ্য থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্যে বিজ্ঞানীর মতো যুক্তির জাল বুনতে হয় উকিল আর জজকেও।

কবির মতোই বিজ্ঞানীকেও মেলতে হয় কল্পনার পাখা। শুধু তফাত এই ঃ কবির কল্পনা হতে পারে বাস্তবের ঊর্ধ্বে, বিজ্ঞানীর কল্পনা একান্তই বাস্তবকে ঘিরে।

মাস্টার আর মুদি। পুলিশ আর জজ। কবি আর উকিল—সবারই কাজের মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞানীর কাজের রেশ।

এর পরও কি আমরা বলব বিজ্ঞানীদের জীবন আর কাজের ধারা অলৌকিক রহস্যে ঘেরা?